পরলোক এবং পুনর্জন্মের
সত্য ঘটনা

॥ শ্রীহরিঃ ॥

বিষয়ানুক্রমণিকা

॥ শ্রীহরিঃ ॥

ঠাকুরদার নাতিরূপে পুনর্জন্ম

(শিবপূজা তথা সনাতন ধর্ম-বিরুদ্ধ দাহ-সংকারের কুপরিণাম)

১৯৬০ সালের মার্চ মাসের কথা। আমি পুনর্জন্মের একটি ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে মুজফ্‌ফরপুরের এক গ্রামে গিয়েছিলাম। একদিন কালীনদীর তীরে দেবমন্দির দর্শন করতে গিয়ে কোনো সাধু মহন্তের সাক্ষাতের আশায় ঘুরছিলাম। হঠাৎ এক জায়গায় আসনে উপবিষ্ট এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারলাম আগাগোড়া গীতাখানি তাঁর কণ্ঠস্থ। তিনি বেদ-উপনিষদগুলিও পড়েছেন এবং যোগসাধনায়ও পারদর্শী। তাঁর ভাল নাম শ্রীমদনানন্দ সরস্বতী। উনি হৃষীকেশ-হিমালয়ের কৈলাসবাসী যোগীরাজ পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীসত্যানন্দজী মহারাজের মুখ্য শিষ্যগণের মধ্যে একজন। শ্রীমদনানন্দজীর বয়স তখন প্রায় পঁচাত্তর বছর। তাঁর একটি চোখ কানা। তাঁর সঙ্গে সৎসঙ্গ করে আমি প্রভূত আনন্দ এবং তৃপ্তি পেয়েছিলাম। শাস্ত্র, পুরাণ এবং অধ্যাত্ম আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন—'আমাদের সনাতন ধর্মের শাস্ত্র-পুরাণাদিতে যে সব কথা লেখা আছে সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু আজকালকার পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে অন্ধ লোকেরা এ সব মানতে নারাজ। এটি আমাদের দেশের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক বলতে হবে। শাস্ত্র-পুরাণাদির কথা ধ্রুব সত্য, তার প্রত্যক্ষ জলজ্যান্ত প্রমাণ স্বরূপ আমি আপনার সামনে বসে, কিন্তু এই ঘোর অবিশ্বাসের যুগে আমার কথা কে

বিশ্বাস করবে ? কিন্তু একটা চোখ না থাকা আর আমার জন্ম হওয়া—এ দুটোই এ বিষয়ে জলজ্যান্ত প্রমাণ।' আমি সন্ত মহারাজের শ্রীমুখ থেকে এ সব শুনে খুব অবাক হলাম আর জিজ্ঞাসা করলাম—'মহারাজ ! শাস্ত্রের কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দয়া করে আমাকে বলুন।'

আমার বারবার অনুরোধ শুনে স্বামীজী বললেন—'বেশ, তবে মন দিয়ে শোনো। আমি ঠাকুরদা হয়ে নাতি রূপে জন্ম নিয়ে কী করে এলাম আর আমার মা ভগবান শ্রীআশুতোষ শংকরের পূজা আরাধনা করে তার ফলস্বরূপ আমাকে পুত্র রূপে কী করে পেলেন তথা দাহ-সৎকারের অনিয়মের ফলে আমার এক চোখ কীভাবে কানা হল—আমার জীবনের এই অদ্ভুত আশ্চর্যজনক অতি সত্য ঘটনা তোমাকে হুবহু শোনাচ্ছি।

'কানপুর জেলার অন্তর্গত দেরাপুর গ্রামে সম্বত ১৯৪২ র কাছাকাছি আমার জন্ম। আমি জাতিতে দুবে ব্রাহ্মণ আর আমার পূজনীয় বাবার ভালো নাম পণ্ডিত শ্রীমধুরী দুবে অর্থাৎ পণ্ডিত মথুরা প্রসাদ দুবে। আমার পূজনীয়া মায়ের ভালো নাম শ্রীমতি দুলারী দেবী আর পূজনীয় ঠাকুরদার নাম শ্রীপরমসুখ দুবে। আমার মায়ের চারটি কন্যাসন্তান হয়েছিল কিন্তু কোনো ছেলে হয়নি। আমার মা পুত্রসন্তান না হওয়ায় খুবই দুঃখ-কষ্টে ছিলেন আর পুত্র লাভের জন্যে সাধুসন্তদের সেবা তথা ভগবানের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করতেন। কোনও এক সৎ ব্যক্তির কথায় তিনি পুত্রলাভের আশায় আশুতোষ ভগবান শ্রীশংকরের শরণাপন্ন হন। আমাদের গ্রামের বাইরে পণ্ডিত কনৌজীলাল মিশ্রর প্রতিষ্ঠিত ভগবান শ্রীশংকরের একটি মন্দির ছিল ; সেটি বীরপহলবানের মন্দির বলে প্রসিদ্ধ। ওখানে গিয়ে মা শ্রীশংকরের পূজা আরাধনা আরম্ভ করে দিলেন। আমার মা সকাল আর সন্ধ্যাবেলায় প্রতিদিন শ্রীশংকরের মন্দিরে যেতেন আর ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে ঠাকুরের ভজন-আর্চা করতেন, প্রদীপ জ্বালাতেন আর কাতরভাবে প্রভুর চরণে একটি পুত্রসন্তানের জন্য প্রার্থনা করতেন। আশুতোষ শংকর ভগবান তো খুব দয়ালু-কৃপাময়। তিনি আমার মায়ের প্রার্থনা শুনলেন।

শাস্ত্রোচিত পথে শ্রীশংকরের পূজা করে তিনি তার কৃপা লাভ করলেন কিন্তু যখন পুত্রলাভের শুভ সম্ভাবনা দেখা দিল ঠিক সেই সময় হঠাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ এক কর্মের অনুষ্ঠানে মহা অনর্থ ঘটে গেল।

'ঘটনাটা হচ্ছে এই যে সেই সময় হঠাৎ আমার পূজনীয় ঠাকুরদা শ্রীপরমসুখ দুবে দেহ রাখলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় নব্বই বছর, আর তিনি ছিলেন একজন প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ। পায়ের নীচ পর্যন্ত আংরাখা পরতেন আর হাতে সর্বদা লাঠি রাখতেন। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর তাঁর শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। আমাদের দেশে প্রথা আছে, আর তা শাস্ত্রবিহিতও বটে যে, সূর্যাস্ত কালে মৃতের মুখাগ্নি করা চলবে না। করলে তা পাপ। এজন্য ওদেশের সবাই সূর্যাস্তের আগেই অগ্নিসংকার করত। কিন্তু আমাদের বাড়ির লোকজন এই নিয়ম না জানার জন্য ওই কাজটি করে বসল অর্থাৎ সূর্যাস্তের সময়ই তাঁর দাহ-সংকার করল যা ছিল একেবারেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং প্রচলিত প্রথাবিরুদ্ধ।

'আমার পূজ্যপাদ ঠাকুরদার শাস্ত্রবিরুদ্ধ দাহ-সংকারের বিষময় ফল এই হল যে, আমার ঠাকুরদাকেই আমার মধ্য দিয়ে নাতির রূপ ধরে এসে আজ পর্যন্ত তার কুফল ভুগতে হচ্ছে, আর সেই নাতি আমি আজ তোমার সামনে বসে আছি এবং ইহজন্মে এক চোখ হারিয়ে কাল কাটাচ্ছি।

একদিন রাত্রে আমার মাকে ঠাকুরদা স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 'তোমরা সূর্যাস্তের সময়ে আমার দাহ-সংকার করায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শুভফল সবই নষ্ট হয়ে গেছে। শংকরের পূজার ফলে তোমার একটি পুত্র-সন্তান হবে আর আমিই তোমার কোলে পুত্ররূপে জন্ম নেব। কিন্তু সূর্যাস্তের সময় আমার দাহ-সংকার হওয়ায় আমার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। সে জন্যে তোমার এক চোখ কানা পুত্র জন্মাবে।'

'মা এই স্বপ্ন দেখে খুব অবাক হলেন। তিনি ঠাকুরদার এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা সকলকে জানালেন। স্বপ্নের কথা বাস্তবে সত্যি হল আর কিছুদিন পরই আমার মায়ের গর্ভসঞ্চার হল এবং আমার ঠাকুরদার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমি এক চোখে কানা হয়ে ভূমিষ্ঠ হলাম।

'আমিই আমার ঠাকুরদা। আমি এই পূর্বজন্মের কথা কী করে বললাম যে, শাস্ত্রবিরুদ্ধ সূর্যাস্তকালে দাহকর্মের ফলে আমার ঠাকুরদাকে নাতি রূপে আমার মধ্যে দিয়ে এসে এক চোখ নিয়ে আজ পর্যন্ত দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে, আর আমার মাও সারাজীবন এক চোখ কানা ছেলে নিয়ে মনস্তাপে ভুগেছেন। যখন আমি একটু বড় হলাম আর একটু একটু কথা বলতে শিখলাম, তখন আমি সকলকে নিজে নিজেই আমি যে ঠাকুরদা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে লাগলাম। আমি সবাইকে বলতে লাগলাম, এই আমার লাঠি যা আমি আগের জন্মে বুড়ো বয়সে নিয়ে হাঁটতাম। এই হচ্ছে আমার আংরাখা যেটা আমি পরতাম, অমুক লোক আমাদের আত্মীয় তাকে ডেকে আনো। তবে এত সব কথা বলা সত্ত্বেও আমার মা এ বিষয়ে কোনো আমল দিতেন না, আর আমাকে ভূতপ্রেতে ভর করেছে বলে আমার সেবা-পরিচর্যা কমিয়ে দিলেন। যত দিন যায় আমি আশ্চর্যজনক অনেক কথা বলতে লাগলাম আর পূর্বজন্মে পুঁতে রাখা টাকার কথা বলে আর তা মাটি খুঁড়ে সবার সামনে বার করে দিয়ে সবাইকে অবাক করে দিলাম। তখন ছোট বড় সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হল যে বাস্তবিক ঠাকুরদাই নাতির রূপ ধরে জন্ম নিয়েছে। এভাবে অনেক দিন পর্যন্ত আমি নিজের পূর্বজন্মের সব কথা বলে আর সেগুলি প্রমাণ করে সকলকে অবাক করে দিচ্ছিলাম। কিন্তু তারপরে মা একদিন আমার কান ফুঁড়ে দিলেন, যার ফলে আমি পূর্বজন্মের সব কথা ভুলে গেলাম।

'শাস্ত্রবিরুদ্ধ আর সনাতন ধর্মবিরুদ্ধ অগ্নিসংস্কারের ফলে আমাকে একটি চোখ হারাতে হল আর আমার আত্মীয়স্বজনদেরও এই ঘটনায় খুব দুঃখ হল, কিন্তু আশুতোষ ভগবান ভোলানাথের আরাধনার ফলস্বরূপ আমার মায়ের পুত্রের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছিল। আমি অনেকদিন পরিবারে ছিলাম। পরে পালোয়ানগিরি করতে আরম্ভ করি আর চাকরিও করি। শেষে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে স্বর্গীয় মহাত্মা যোগীরাজ সন্ত, পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীসত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের আশ্রয়ে এলাম, আর তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলাম। আমার মা আমার নাম রেখেছিলেন মদন। পূজ্যপাদ

গুরুদেবকে আমি ওই নামই বলেছিলাম, তখন গুরুদেব সন্ন্যাসগ্রহণের পর ওই নামানুসারে আমার নাম রাখলেন মদনানন্দ সরস্বতী। শ্রীগুরুদেব কৃপা করে আমাকে গীতা, উপনিষদ্ আদি সব শিখিয়েছিলেন। তাঁর আশ্রমে অনেক গোরু ছিল আর ওই গোরুগুলির সেবা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। উনি আমাকে যোগশিক্ষাও দিয়েছিলেন। এইভাবেই তিনি আমাকে পরমার্থ পথের পথিক তৈরি করেছেন। আমার জীবনের সব সত্য ঘটনাবলী থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে আর আমি নিশ্চিত যে শাস্ত্র-পুরাণে শিব, বিষ্ণু, আরাধনার যেসব ফলের কথা বলা হয়েছে তা সবই পূর্ণরূপে সত্য। আমার মা আমাকে শংকর ভগবানের আরাধনা করে পেয়েছিলেন এটি তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শাস্ত্র-পুরাণ আদিতে যে সব কথা লেখা আছে আর তা পালন করলে যে মহাপুণ্য ফলের কথা বলা হয়েছে তথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম করার যে ভয়ংকর, বিষম ফলের কথা লেখা আছে তার সত্যতা সম্বন্ধে ভালমন্দ সব আমার জীবনেই উপলব্ধি করেছি। শাস্ত্রবিরুদ্ধ সূর্যাস্তের সময় মৃতের অগ্নিসংকারের দরুন আমাকে একটা চোখ হারাতে হয়েছে। শাস্ত্র-পুরাণে যে পুনর্জন্মের হাজার হাজার ঘটনা ছড়ানো রয়েছে, যা আজকালকার মানুষ বিশ্বাস করে না কিন্তু সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য —আমি নিজে প্রত্যক্ষভাবে জেনেছি, যা আপনাকে প্রমাণ দিয়ে দিয়ে বললাম।'

এ হল এক অনাসক্ত বীতরাগ সন্ন্যাসীর জীবনের অদ্ভুত আশ্চর্যজনক সত্যি ঘটনা যা আপনার সামনে তুলে ধরলাম, যার দ্বারা আমাদের শাস্ত্র-পুরাণের সব কথাই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়। এই ঘটনার দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, শাস্ত্ররীতি মেনে চললে আমাদের নিশ্চিতরূপে মঙ্গল এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ পথে চললে অধঃপতন অনিবার্য। আশাকরি পাঠকগণ এই সত্য ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করে শাস্ত্র-পুরাণের অদ্ভুত মাহাত্ম্য স্বীকার করবেন আর শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে নিজের, নিজ কুলের, দশের তথা দেশের কল্যাণসাধন করবেন।

——— ০ ———

প্রেতের পুনর্জন্ম

কয়েক দশক পূর্বে মুজফ্‌ফরপুর জেলার এক গ্রামে এমন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল যা, আমাদের শাস্ত্র-পুরাণের কথাগুলি ধ্রুব সত্য বলে প্রমাণ করে। আমাদের শাস্ত্রে এবং পুরাণে উল্লিখিত পুনর্জন্ম এবং প্রেত-যোনি প্রাপ্তি বিষয়ক অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্নে উল্লিখিত একটি বালকের জীবনে তা চরিতার্থ হয়ে ওঠে যা আধুনিককালের ঘোর নাস্তিক এবং অবিশ্বাসীদেরও সম্পূর্ণভাবে অবাক করে।

আমি একটি খবরের কাগজে পড়েছিলাম—'মুজফ্‌ফরপুর জেলার খেড়ি আলিপুর গ্রামে এক জাঠের ঘরে এমন এক বালক জন্ম নিয়েছে যে সে নিজের পূর্বজন্মের কথা হুবহু বলছে এবং সে এও বলছে যে সে নয় বছর ধরে একটা অশ্বত্থ গাছের উপরে প্রেত হয়ে বাস করেছিল।' এই খবর পড়ে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। আমি এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে স্বয়ং মুজফ্‌ফরপুর গেলাম আর সেখানে 'ব্রাহ্মণ বাণী' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত গোস্বামী ব্রহ্মদত্ত শর্মার সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি নিজের যাচাই করা সত্যি ঘটনা আমাকে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলেন। কিন্তু এতেও যখন আমার বিশ্বাস হল না তখন ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে পুনরায় আমার ছেলে শ্রীমান শিবকুমারকে সঙ্গে নিয়ে মুজফ্‌ফরপুর গেলাম আর ওখান থেকে সুপ্রসিদ্ধ সন্ত শ্রীকল্যাণদেবজীকে সঙ্গে নিয়ে খেড়ি-আলিপুর গ্রামে পৌঁছুলাম। সেখানে পূর্বজন্মের কথা বলা ওই ছেলেটির জ্যাঠা শ্রীশীতলপ্রসাদ ও ওর অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে এবং গ্রামের অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা করি আর বাস্তব ঘটনাটা কী তার পুরোপুরি ব্যাপারটা জানতে চাই। ওই গ্রাম থেকে ফিরে আসার পর পুনরায় পণ্ডিত শ্রীব্রহ্মদত্ত শর্মার সঙ্গে দেখা করি। সর্বপ্রথমে আমি সুপ্রসিদ্ধ আর্যনেতা পণ্ডিত ব্রহ্মদত্ত শর্মাজীর নিজে যাচাই করা ঘটনাটি তিনি যেমনভাবে

আমাকে বলেছিলেন সেইভাবেই পাঠকবর্গের সামনে উপস্থিত করছি—

পণ্ডিত ব্রহ্মদত্ত শর্মাজীর তদন্তের বিবরণ—

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ব্রহ্মদত্ত শর্মা বললেন—'মুজফ্‌ফরনগর জেলায় এই কথা রটনা হয়েছিল যে, শিকারপুর গ্রামে একটি পাঁচ বছরের ছেলে আগের জন্মের সব কথা বলে যাচ্ছে। কাশীর 'সন্মার্গ' পত্রিকায়ও এ খবর ছাপা হয়েছিল। এ কথায় আমার কোনো বিশ্বাস ছিল না এবং এতে আমার কোনো আগ্রহও ছিল না। কিন্তু সকলে বারবার বলাতে আমি একদিন শিকারপুরে পৌঁছলাম। আমি যখন ছেলেটিকে দেখতে গেলাম তখন সে ঘুমোচ্ছিল। তাকে জাগানো হল। ছেলেটির বয়স পাঁচ বছর হবে আর একটু তোতলা। ছেলেটি শ্রীলক্ষ্মীচন্দ্রের বাড়িতে ২৮-৪-১৯৫১ থেকে এসে বসবাস করছে। সে পণ্ডিত লক্ষ্মীচন্দ্রকে বাবা আর তাঁর স্ত্রীকে মা বলে ডাকে। পণ্ডিত লক্ষ্মীচন্দ্রের তিন মেয়ে, প্রকাশবতী, কৈলাসবতী আর সরলাদেবী ; বয়ঃক্রম ১৭, ২০ এবং ২৮ বছর। দুই ছেলে, রবিদত্ত আর বিষ্ণুদত্ত, বয়ঃক্রম ১০ এবং ১২ বছর। এদের সকলের সঙ্গে ছেলেটি বেশ আনন্দেই আছে।

মুজফ্‌ফরনগর জেলার খেড়ি আলিপুর গ্রামে কালিদাস জাঠের ঘরে এই ছেলেটির পূর্বে জন্ম হয়েছিল, সেখানে তার নাম রাখা হয় বীরসিংহ। যখন এর বয়স সাড়ে তিন বছর, তখন থেকে এ বলতে থাকে, 'আমার ঘর শিকারপুরে, আমার নাম সোমদত্ত। আমার বাবার নাম পণ্ডিত লক্ষ্মীচন্দ্র আর আমার মা মেলায় যাবার সময় আমাকে অনেক পয়সা দিত।' এ খবর চারদিকে প্রচার হয়ে গেল। খবর পেয়ে ২৪-৪-১৯৫১ তারিখে লক্ষ্মীচন্দ্রও শিকারপুর থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরের খেড়ি গ্রামে গেল। সেখানে সেই খবর পাওয়া মাত্র হাজার হাজার লোক জমে গেল। ছেলেটিকে আনা হল। সব লোকের মাঝে ছেলেটি লক্ষ্মীচন্দ্রকে জাপটে ধরে 'বাবা, বাবা' বলে ডাকতে লাগল। ছেলেটিকে শিকারপুর নিয়ে যাওয়া হল। গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছতেই ছেলেটি চেঁচাতে লাগল—'এই তো আমার গাঁ শিকারপুর এসে গেছি।' রাস্তার মাঝে নিজেই পণ্ডিত লক্ষ্মীচন্দ্রের বাগান,

কুয়ো ইত্যাদি দেখে বলতে লাগল, 'এগুলো আমাদের।' গ্রামে ঢুকেই ওকে একলা ছেড়ে দেওয়া হল। সে তখন একলাই গলির রাস্তা ধরে চৌমাথায় গিয়ে পৌঁছোল। বহু লোক এই কৌতুক দেখছিল। এই চৌমাথার কাছেই লক্ষ্মীচন্দ্রের বাড়ি। একে অন্য একটা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলে সে বলে উঠল—'এ বাড়ি আমাদের নয় ; এ তো পাটোয়ারীদের বাড়ি।' বাস্তবিক সেটা পাটোয়ারীদেরই বাড়ি ছিল। আস্তে আস্তে গিয়ে ও পণ্ডিত লক্ষ্মীচন্দ্রের ঘর খুঁজে ঢুকে পড়ল। সেখানে গ্রামের অনেক বউ-ঝিরা জড়ো হয়েছিল। লক্ষ্মীচন্দ্রের প্রত্যেকটি মেয়েকে সে এক এক করে চিনিয়ে দিল। লক্ষ্মীচন্দ্রের স্ত্রীকে দেখে বলল—'এই আমার মা।' কিন্তু তার থেকে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করা হল—'তুমি মায়ের কাছ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে কেন ?' ছেলেটি তখন বলতে লাগল—'আজ তো মা আমাকে কিছুই দিল না, তাহলে আমি ওর কোলে যাব কেন ?' এ কথা শুনে লক্ষ্মীচন্দ্রের স্ত্রী কৌতূহলী হয়ে একটি পাঁচ টাকার নোট নিয়ে এসে তাকে দেখাল। নোট দেখেই ছেলেটি 'মা মা' বলে দৌড়ে তার কোলে উঠে বসল। জিজ্ঞাসা করতে সে বলল—'আমি সেই প্রেত অবস্থায় কুয়োয় নেমে জল খেতাম আর ঘরে ঢুকে রুটি খেয়ে নিতাম।' এরপর সে লক্ষ্মীচন্দ্রের এক পুরোনো চাকর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল—'অমুক নামের যে চাকর ছিল, সে এখন কোথায় ?' তাকেও সে ওই ভিড়ের মাঝে চিনে ফেলে। এইভাবে সে তার পূর্বজন্মের ভাইদের একে একে চিনে নিল। এখন ছেলেটি খেড়ি গ্রামে, যেখানে সে জন্মেছে সেখানে যেতে চায় না। জোর করে ওকে দুবার খেড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু ওখানে গিয়ে ও খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। ছেলেটি বলত—'আমি তো ব্রাহ্মণের ছেলে আর এরা তো জাঠ। আমি জাঠের ঘরে কাঁচা সিদ্ধ খাবার কেন খাব ? মাটির হাঁড়ির দুধ পর্যন্ত খাব না।' চার-পাঁচদিন তারা আলাদা হাঁড়িতে দুধ এনে খাওয়াতে লাগল আর শেষে যখন হয়রান হয়ে গেল তখন রেগে ওকে শিকারপুর লক্ষ্মীচন্দ্রের ঘরে পাঠিয়ে দিল। এখন সে আগের জন্মের মা-বাবার কাছেই শিকারপুরে থাকে। তাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে।

স্কুলের মাস্টার তথা গ্রামের নাম-করা লোকেদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তারাও উপরিউক্ত খবর ছাড়াও অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা জানিয়েছেন। পণ্ডিত লক্ষ্মীচন্দ্র তার ছেলেদের তথা অন্য লোকেদের কাছেও তার বলা কথাগুলি সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে।

পণ্ডিত লক্ষ্মীচন্দ্র আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—'বলুন তো ! একে যখন স্কুলে ভর্তি করব তখন এর বাবার নাম কী লেখাব। এ জন্মসূত্রে তো কালিদাস জাঠের ছেলে কিন্তু পূর্বজন্মসূত্রে আমিই ওর বাবা, কী করব ? আমার কাছে থাকলে ওর বর্ণই বা কী হবে, আর বিয়েই বা কোন বর্ণের সঙ্গে হবে ?'

এই ঘটনা থেকে পুনর্জন্মের কথা সত্যি বলে প্রমাণিত হচ্ছে, ওখানে ন-বছর ধরে অশ্বত্থ গাছে প্রেত হয়ে থাকাও এক অদ্ভুত আশ্চর্যজনক কথা এবং ন-বছর ধরে গ্রামের বিভিন্ন ঘটনার খবরাখবর রাখার দ্বারা প্রমাণ হয় যে নিশ্চয় সে ন-বছর ধরে প্রেত হয়ে অশ্বত্থ গাছেই বাস করছিল। পণ্ডিত লক্ষ্মীচন্দ্রের বক্তব্য হল ১৪ বছর আগে যখন তার ছেলে সোমদত্ত সাড়ে তিন বছরের হয়ে মারা যায় সে সময় কৈলাসবতী ছয় বছরের আর প্রকাশবতী দুই বছরের ছিল। বিষ্ণুদত্ত এক বছরের ছিল আর সরলা, রবিদত্তর জন্ম তো এই ছেলেটির মরার পর হয়েছে। ছেলেটি কৈলাসবতী (২০ বছর), প্রকাশবতী (১৬ বছর) তথা বিষ্ণুদত্তর পরে যারা জন্মেছে এমন বাচ্ছাদেরও চিনে ফেলেছে কারণ সে (সোমদত্ত) মরার পর ন-বছর ধরে অশ্বত্থ গাছে প্রেত হয়েই ছিল।

অশ্বত্থ গাছে প্রেত হয়ে থাকার ঘটনা কি পুরাণোক্ত 'প্রেতযোনি' সত্ত্বার সত্যতা প্রমাণ করে না ?

ঘটনার অনুসন্ধান

আমি আমার সাংবাদিক পুত্র শিবকুমার গোয়েলকে সঙ্গে নিয়ে পূজ্যপাদ শ্রীকল্যাণদেবজীর সঙ্গে খেড়ি পৌঁছে জানতে পারলাম যে ঘটনাটি অবশ্যই অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। বালক বীরসিংহ (বর্তমান জন্মের নাম) পূর্বজন্মের বাবা-মা পণ্ডিত লক্ষ্মীচন্দ্রের কাছেই থাকে, আর তার পূর্বজন্মের

বাবা শ্রীলক্ষ্মীচন্দ্র এখন শিকারপুর থেকে অন্যত্র চলে গেছে। লক্ষ্মীচন্দ্র এখন নৈনিতালে থাকে। ছেলেটিও তার সঙ্গে গেছে আর তাকে সে আপন ছেলের মতোই লালনপালন করে। ছেলেটি এখনও কখনো কখনো এ জন্মের মা-বাবার কাছে খেড়িতে আসা-যাওয়া করে। আমি ছেলেটির জ্যাঠা শ্রীশীতলপ্রসাদ জাঠ তথা গ্রামের আরও অনেক লোকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। তারা আমাকে সমস্ত ঘটনাটা এভাবে শুনিয়েছিলেন— 'কালিদাস জাঠের ঘরে যখন এই বালক জন্ম নেয় তখন স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারেনি যে এই ছেলে পূর্বজন্মে শিকারপুরের শ্রীলক্ষ্মীচন্দ্রের ছেলে ছিল আর ও এখানে না থেকে পূর্বজন্মের মা-বাবার কাছে চলে যাবে। একবার আমাদের আলিপুর খেড়ির বাইরে বাগানে ও খেলছিল। হঠাৎ ওই বাগানের সামনে দিয়ে লক্ষ্মীচন্দ্রের স্ত্রী যাচ্ছিল। মনে হয় তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন আর একেবারে বীরসিংহের দৃষ্টি ওর উপর গিয়ে পড়ল। তখনি ওর পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যায় যে উনি নিশ্চয় শিকারপুরের মেয়ে এবং ওর পূর্বজন্মের মা। ও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ইত্যবসরে তিনি অনেকটা চলে গিয়েছিলেন। এরপর ছেলেটি ঘরে এসে এ জন্মের মাকে বলে—'মা, আমার আগের জন্মের মা আজ বাগানের কাছে এসেছিল কিন্তু আমার সঙ্গে কথা না বলেই আমার সামনে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।' এ কথা শুনে মায়ের বা অন্য সকলের খুব অবাক লাগল। কিন্তু ওর মা-বাবা বা অন্য সকলে বুঝল এ তো শিশু তাই শিশুসুলভ কথাই বলছে। মা বলে—'হ্যাঁরে! আমিই তো তোর মা ; আর কে তোর মা হতে যাবে? তুই ছেলেমানুষ ; যা খেলতে যা।' ছেলেটি খেলা করতে চলে গেল আর সেই কথা ভুলে গেল।

আলিপুর খেড়ির কাছে হিণ্ডন নদীর ধারে প্রত্যেক বছর কার্তিক পূর্ণিমায় বড় মেলা বসে। বহুলোক ওই দিনে নদীতে স্নান করতে আসে। একবার আলিপুর খেড়ি থেকে অনেক নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো-বুড়ি নদীতে স্নান করতে যাচ্ছিল। ছেলেটিও মেলায় যাবে বলে জেদ ধরল। বলল—'কত ছেলে মেলায় যাবে, আমিও যাব।' ঘরের লোক ছেলের

জেদ দেখে তাকে গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে মেলায় পাঠিয়ে দেয়। তার মা তাকে মেলায় কিনে খাবার জন্যে দু-আনা পয়সা দেয়। কিন্তু সে দু-আনা পয়সায় খুশি নয়। এত বড় মেলায় দুআনা পয়সা পেয়ে তার মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। সে রাস্তায় মুন্সিলাল মাস্টারকে দেখতে পেয়ে বলে— 'দেখুন, আমার এই জন্মের মা কেমন ! আমাকে এত বড় মেলা দেখতে মোটে দু-আনা পয়সা দিয়েছে। বলুন তো এই দু-আনায় কী হবে ? আমার আগের জন্মের মা খুব ভাল ছিল, আমি যখনই কোনো মেলায় যেতাম, আমাকে হাত ভরে পয়সা দিত। ও মা আমার এর মতো কিপটে ছিল না।' বালকের কথা শুনে মুন্সিলাল অবাক হয়ে ভাবেন, এ ছেলে এ আবার কী বলছে ? প্রথমে তো এর সব কথা ছেলেমানুষি মিথ্যা মনে করে ভেবেছিলেন, এতটুকু ছেলে, তবু এত মিথ্যা কথা বলতে শিখেছে। একে বিশ্বাস নেই। কেউ কি এভাবে পূর্বজন্মের কথা বলতে পারে ? কিন্তু বালকটির মুখে বারবার একই কথা শুনে তাঁর খুব কৌতূহল হল। তিনি বালকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোর আগের জন্মের মা কোথায় থাকে ?' 'আমার আগের জন্মের মা শিকারপুরে থাকে'— সে উত্তর দেয়। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন—'তোর পূর্বজন্মের বাবার নাম কী ?' উত্তরে ছেলেটি বলে—'আমার বাবার নাম পণ্ডিত শ্রীলক্ষ্মীচন্দ্র' আরও বলে—'পূর্বজন্মে আমার নাম ছিল সোমদত্ত।' এছাড়া সে তাকে আরও অনেক কথা বলতে থাকে যা শুনে মুন্সিলাল খুব অবাক হয়ে যান আর এর সব কথা নোটবুকে নোট করে নেন। পরে চিন্তাভাবনা করে ঠিক করেন যে যদি এসময় শিকারপুরের কাউকে পাই তো জানা যাবে সত্যি শিকারপুরে পণ্ডিত লক্ষ্মীচন্দ্র বলে কোনো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন কিনা। আর যদি থাকেন তবে তার সোমদত্ত বলে কোনো ছেলে ছিল কিনা। একদিন ঘটনাক্রমে কোথাও যেতে যেতে স্বয়ং পণ্ডিত লক্ষ্মীচন্দ্রের সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়ে গেল। উনি তাকে চিনতেন না। পণ্ডিত লক্ষ্মীচন্দ্র কোথাও দরকারি কাজে যাচ্ছিলেন। মুন্সিলাল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'মহাশয় ! আপনি কোথায় থাকেন ?'

লক্ষ্মীচন্দ্র—'আমি শিকারপুরে থাকি।' মুন্সিলাল তো শিকারপুরের লোকই খুঁজছিলেন। তাই চট্ করে জিজ্ঞাসা করলেন—'শিকারপুরে পণ্ডিত শ্রীলক্ষ্মীচন্দ্রকে আপনি চেনেন ?' উত্তরে লক্ষ্মীচন্দ্র বললেন—'আমার নামই শ্রীলক্ষ্মীচন্দ্র।' তখন মুন্সিলাল জিজ্ঞাসা করেন—'আপনার সোমদত্ত বলে কোনো ছেলে ছিল ?' উত্তরে লক্ষ্মীচন্দ্র স্বীকার করলেন আর বলেন—'হ্যাঁ, আমার সোমদত্ত নামে একটি ছেলে ছিল।'

মুন্সিলাল—'আপনার সোমদত্ত নামের ছেলে কি মারা গেছে ?'

লক্ষ্মীচন্দ্র—'হ্যাঁ, সোমদত্ত মারা গেছে।' তখন মুন্সিলালের পুরোপুরি বিশ্বাস হয়ে গেল যে তাকে বীরসিংহ পূর্বজন্মের যে যে কথা বলেছিল তা ওর বালকোচিত কথা নয়, বরং পুরোপুরি সত্যি।

যখন পণ্ডিত শ্রীলক্ষ্মীচন্দ্র তাঁকে এত সব জিজ্ঞাসা করার কারণ জানতে চাইলেন তখন মুন্সিলাল আদ্যোপান্ত সব ঘটনা তাঁকে শুনিয়ে বললেন—'লক্ষ্মীচন্দ্রবাবু ! আপনার সোমদত্ত বলে যে ছেলে ছিল আর যার মৃত্যু হয়েছে, সে আবার খেড়ি আলিপুরে কালিদাস জাঠের ঘরে জন্ম নিয়েছে। ওর নাম এখন বীরসিংহ, আর ও আপনাকে আর আপনার স্ত্রীকে ভাল রকম মনে রেখেছে।' একথা শুনে পণ্ডিত লক্ষ্মীচন্দ্র খুব অবাক হয়ে গেলেন কিন্তু তাঁর সহজে বিশ্বাস হল না। তখন তিনি তাঁর জরুরি কাজ ফেলে দিয়ে একদম সোজা খেড়ি আলিপুরের পথ ধরলেন। খেড়ি গ্রামে পৌঁছে একটা রাস্তার চৌমাথায় বসলেন। একটি ছেলেকে দেখে তাকে দিয়ে বীরসিংহকে ডাকতে পাঠালেন। বীরসিংহ কোনো দিন পণ্ডিত লক্ষ্মীচন্দ্রকে দেখেনি। যখন সে এল তখন একদম সোজা দৌড়ে গিয়ে পণ্ডিত শ্রীলক্ষ্মীচন্দ্রের কাছে গেল আর তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ওধারে লক্ষ্মীচন্দ্র ফোঁপাতে থাকে, এধারে বীরসিংহও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। এভাবে দুজনকে কাঁদতে দেখে সেখানে যারা ছিল তাদের মন দুঃখে ভরে গেল। সে এক ভীষণ করুণ আর মর্মস্পর্শী দৃশ্য। এ এক অদ্ভুত আশ্চর্যজনক ঘটনা যা কখনো কেউ দেখেনি বা কানে শোনেনি। কিছুক্ষণ পর পণ্ডিত লক্ষ্মীচন্দ্র বালকের ঘরের লোকজনদের

বললেন—'একে আমাকে দিয়ে দাও'। কিন্তু ছেলেটির বাবা বলে—'ভাল কথা বলেছেন তো, ছেলে কি কাউকে দেবার জিনিস ? আমার ছেলে আপনাকে কি করে দেব ? এখন তো এ ছেলে আমার।' ছেলেটি পণ্ডিত লক্ষ্মীচন্দ্রকে জাপটে ধরে বসে ছিল এবং চাইছিল যে 'আমাকে লক্ষ্মীচন্দ্র তার সঙ্গে নিয়ে যায় তো ভাল হয়।'

এই অদ্ভুত ঘটনার কথা বিদ্যুতের মতো গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ ছেলেটিকে দেখতে আসতে লাগল। অবশেষে জনতার মাঝ দিয়ে ছেলেটিকে শিকারপুরে নিয়ে যাওয়া হল আর সবার সামনে সে তার পূর্বজন্মের মা ও ভাই-বোনদের চিনে নিল আর প্রমাণ করে দিল যে সে কীভাবে ন-বছর ধরে একনাগাড়ে অশ্বত্থ গাছে প্রেত হয়ে ছিল আর গ্রামের সব ব্যাপার বরাবর দেখত। তার প্রেত অবস্থায় থাকাকালীন লক্ষ্মীচন্দ্রের বাড়িতে কবে কখন কিভাবে তার ভাই-বোনেরা জন্ম নিল এসব সে ঠিক ঠিক দেখেছে। সবার সামনে তাদের সবাইকে সনাক্ত করে সে সকলকে অবাক করে দিল।

ছেলেটির জ্যাঠা শ্রীশীতলপ্রসাদ জাঠের সঙ্গে কথা বলার পর বুঝতে পারলাম উনি 'আর্যপন্থী' আর আর্যসমাজ আন্দোলনে বহুবার জেল খেটেছেন। তার সঙ্গে আমার যে কথোপকথন হয়েছিল তা নিম্নরূপ—

প্রশ্ন—'আপনার ভাল নাম কী ?'

উত্তর—'আমার নাম শীতলপ্রসাদ'।

প্রশ্ন—'ছেলেটি আপনার কে হয় ?'

উত্তর—'ছেলেটি আমার জ্ঞাতি ভাইপো। আমি তার জ্যাঠা।'

প্রশ্ন—'ছেলেটি কি আপনাকে তার পূর্বজন্মের কথা ঠিক ঠিক বলেছিল ?'

উত্তর—'হ্যাঁ, পুরোপুরি ঠিক ঠিক বলেছিল।'

প্রশ্ন—'আপনার কোনো সন্দেহ নেই তো ?'

উত্তর—'যদি ছেলেটি ঠিক ঠিক কথা না বলত, ওর কথা যদি পুরোপুরি সত্যি না হত তাহলে আমি এমনি এমনি নিজের ছেলেকে ওই ব্রাহ্মণের

হাতে দিয়ে দিতাম ? কেউ কি নিজের ছেলেকে এমনভাবে অন্য কাউকে দেয় ?'

প্রশ্ন—'ছেলেটি এখন কোথায় ?'

উত্তর—'ছেলেটি এখন তার পূর্বজন্মের মা-বাবা শ্রীলক্ষ্মীচন্দ্রের সঙ্গে শিকারপুর থেকে নৈনিতাল জেলায় চলে গেছে।'

প্রশ্ন—'ছেলেটি কি আপনার কাছে যাওয়া-আসা করে ?'

উত্তর—'ওখানেও থাকে, এখানে আমার কাছেও থাকে। এখন তো ওর দু-ঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ, এজন্য দু-জায়গাতেই থাকে। ওকে আমরা খুব ভালোবাসি।'

প্রশ্ন—'ও কি সত্য বলেছিল যে ন-বছর ধরে ও অশ্বত্থ গাছে প্রেত হয়ে বাস করেছে ?'

উত্তর—'হ্যাঁ, ও অশ্বত্থ গাছে প্রেত হয়ে থাকার কথাও বলেছে।'

এভাবে অনেক কথাবার্তা হল এবং তারপর আমরা তাদের সকলের ফোটো তুলে চলে আসি।

——— ০ ———

যশবীরের কথা

মনুষ্যদেহে প্রেতের আবির্ভাব সম্বন্ধে এক ঘটনার কথা ১৯৫৮ সালে জানুয়ারি মাসের মিরাটের এক মাসিক পত্রিকা 'ত্যাগী ব্রাহ্মণে' পড়েছিলাম। আর এই খবরটি নবভারত টাইমস আদি পত্রিকাতেও বেরিয়েছিল। আমি এই ঘটনার সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে নিজে কাগজে লেখা ঘটনাস্থল রসুলপুর জাটান নামক গাঁয়ে গিয়েছিলাম এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছেলেটির বাবা চৌধুরী শ্রীগিরিধারী সিংহ জাঠের সঙ্গে দেখাও করেছিলাম। গাঁয়ে আরও অনেক লোকের সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং ওই ছেলেটিকে নিজের কাছে বসিয়ে তার সমস্ত কথা শুনেছিলাম। ঘটনাটি এইরকম—

মুজফ্‌ফরনগর জেলার রসুলপুর গ্রামে শ্রীগিরিধারী সিংহ নামে এক জাঠ বাস করতেন। তাঁর ছেলে হলেন রাজারাম সিংহ। রাজারাম সিংহের ছেলের নাম হল যশবীর সিংহ। সে যখন ৩ বছর ৪ মাসের তখন তার বসন্ত রোগ হয়। বহু চিকিৎসা করানো হয় কিন্তু রোগ সারে না। শেষে ওই রোগেই ছেলেটি মারা যায়। ছেলেটি মারা গিয়েছিল রাত্রে। সকলে ঠিক করল রাত অনেক হয়ে গেছে সুতরাং কাল সকালে ওকে পোড়ানোর ব্যবস্থা করা যাবে। তারপর যশবীরের মৃতদেহ কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে দেওয়া হয়।

মুজফ্‌ফরনগরেরই আর এক গ্রাম 'বহেড়ি'র কাছে 'রোহানা মিলে'র চৌধুরী শংকরলাল ত্যাগীর এক ছেলে ছিল শোভারাম ত্যাগী। তার বয়স তখন প্রায় ২৪-২৫ বৎসর। শোভারামের বিয়ে হয়েছিল। তার দুটি মেয়ে একটি ছেলেও ছিল।

একবার একটি বরযাত্রীর দল কেন্দকী গ্রাম থেকে মুজফ্‌ফরনগর জেলার 'নির্মাণ' গ্রামে যাচ্ছিল। ওই দলে বহেড়ির শংকরলাল ত্যাগীর

ছেলে শোভারাম ত্যাগীও ছিল। সে বরযাত্রীদের সঙ্গে নিজের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় হঠাৎ সে গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে যায় আর গাড়ির চাকা তার বুকের উপর দিয়ে চলে যায়। সাংঘাতিক চোট লাগায় সে তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়ে। তার এই অবস্থা দেখে সকলে খুব ভয় পেয়ে যায়। তাকে সেই অচৈতন্য অবস্থাতেই গাড়িতে শুইয়ে নিয়ে রোহানা মিলের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই রাত্রেই প্রায় ১১টায় শোভারাম মারা যায়। সেখানেই তার দাহ-সংকার করে দেওয়া হয়। শোভারামের মৃত্যু ঠিক ওই দিনই হয়েছিল যেদিন রসুলপুর জাঠা গ্রামের গিরিধারী সিংহ জাঠের ছেলে যশবীর বসন্ত রোগে মারা যায়।

সকালবেলায় যখন সকলে কান্নাকাটি করতে করতে যশবীরের মৃতদেহ উঠিয়ে জঙ্গলে শ্মশানে পোড়াবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন অনেকে আশ্চর্য হয়ে দেখে যে যশবীরের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হতে আরম্ভ করেছে। যশবীর আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে বসে। তাই দেখে সকলেই খুব খুশি হল এবং সেই সময় সকলে মনে করল যশবীর বেঁচে গেছে। যশবীরের দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রাণ আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা কোনোক্রমেই তা ছিল না। পরে লোকেরা অবাক হয়ে গেল এই দেখে যে যশবীরের মৃতদেহ বাস্তবে বেঁচে উঠলেও কিন্তু তাতে যশবীরের আত্মা নাই। তাতে অপর কোনো লোকের আত্মা প্রবিষ্ট হয়েছে। কথাটাও ঠিক তাই-ই। যশবীরের মৃতদেহে বহেড়ির শোভারাম ত্যাগীর আত্মা প্রবেশ করেছিল। বালক যশবীরের মৃতদেহে শোভারাম ত্যাগীর আত্মা প্রবেশ করার পরও তার নিজের পূর্বজন্মের কথা মনে হচ্ছিল। যশবীরের ছোট্ট বালকের দেহে ২৪ বছরের যুবকের আত্মার প্রবেশ, ব্রাহ্মণ-শরীর থেকে জাঠ দেহে আশ্রয় এবং পুনশ্চ নিজের বহেড়ি গাঁয়ের পত্নী, সন্তান এবং পরিবারের লোকজনেদের কথা স্মরণ করে শোভারাম মনে মনে খুব অশান্তি আর দুঃখ ভোগ করছিল। সে বলল— 'আমি তো ত্যাগী ব্রাহ্মণ আর তোমরা জাঠ। তোমাদের ঘরের খাবার আমি খাব না। তোমাদের ঘরে মাটির হাঁড়িতে যে শাক রাঁধ, আমি তা খেতে পারব না।

আমাকে বামুন ঘরের খাবার এনে দাও।' তখন সেই জাঠ পরিবারের লোকেদের খুব চিন্তা হল। তারা ভাবল এ যদি খাওয়াদাওয়া না করে তবে তো ক্ষুধা-পিপাসায় মারা যাবে। অতএব তার জন্য এক সদাচারী ব্রাহ্মণ-পরিবারের মহিলার হাতে রাঁধা খাবারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। কয়েক বছর এই ব্রাহ্মণীই নিজের হাতে রুটি, তরকারি করে তাকে খাওয়াচ্ছিল। তারপর একদিন যশবীর জাঠের ঘরের সব খাওয়া বন্ধ করে দিল। এমনকি মাটির হাঁড়িতে দোয়া দুধ পর্যন্ত খাওয়া বন্ধ করে দিল। শুদ্ধতা ও পবিত্রতার প্রতি সে ক্রমেই সজাগ হতে লাগল। মাটির হাঁড়ির বদলে পিতলের হাঁড়িতে করে দুধ গরম করে দিলে সে সেই দুধ খেয়ে নিত। এরপর প্রায় চার বছর পরের কথা। একদিন যশবীরের মা রাজকলি জাঠনি থেকে তাকে নিয়ে তার মায়ের কাছে যাচ্ছিল। পথের মাঝে ওই জায়গাটি অতিক্রম করতে হয় যেখানে গাড়ি থেকে পড়ে শোভারাম মারা গিয়েছিল। সেখানে দুটো রাস্তা দু-দিকে চলে গিয়েছে, একটা গ্রাম বহেড়ির দিকে আর একটা গ্রাম পরই এর দিকে। বালক যশবীর তার মাকে বলে—'মা ! আমি যখন শোভারাম ছিলাম তখন এইখানে গাড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। আমাদের বাড়ি যাবার রাস্তা ওই দিকে (বহেড়ি গ্রামের দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়)। মা কিন্তু ছেলের কথা কানে না তুলে তার হাত ধরে টানতে টানতে তার মায়ের বাড়ি 'পরই' নিয়ে গেল।

১৯৫৮ সালের মার্চ মাসের কথা। বহেড়ির বাসিন্দা 'কেন কো-অপারেটিভ সোসাইটি'র ম্যানেজার শ্রীজগন্নাথ প্রসাদ একদিন নিজের কাজে ওই রসুলপুরের জাঠান গ্রামে গিয়েছিল। ওখানে গিরিধারী সিংহ জাঠের সেই ছেলে যশবীর গ্রামের অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা করছিল। ওর সামনে দিয়ে বহেড়ির জগন্নাথকে আসতে দেখেই সে তাকে চিনে ফেলে আর জগন্নাথকে জোরে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে। জগন্নাথ চার দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে কে তাকে এখানে ডাকছে, কিন্তু তার পরিচিত কাউকে দেখতে পেল না। তাই সে যাবার জন্যে আবার পা বাড়াল।

বালক যশবীর আবার ডাকল—'ও জগন্নাথ ! শোনো, এখানে এস,

আমি ডাকছি।' জগন্নাথ শুনতে পেয়ে তার কাছে এল আর যশবীর জগন্নাথকে কুশল বিনিময় করে বলল—'জগন্নাথ, তুমি আমাকে আমাদের গ্রাম বহেড়িতে নিয়ে চল।' জগন্নাথ তো তাকে আগে কোনোদিন দেখেনি আর তাকে জানেও না। সুতরাং সে খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কে ? কার ছেলে ?' একথা শুনে যশবীর তাকে বহেড়ির শংকরলাল ত্যাগীর ছেলে বলে সব ঘটনার পরিচয় দিল। জগন্নাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'তুমি এখানে কী করে এলে ?' উত্তরে যশবীর জানাল—'পড়ে গিয়ে মরার পর আমি আর কোনো খালি জায়গা না পেয়ে এই শরীরটায় প্রবেশ করেছি।'

জগন্নাথ গাঁয়ে গিয়ে আদ্যোপান্ত সব কথা গাঁয়ের লোকদের শোনাল। গাঁয়ে যে শুনল সেই অবাক হয়ে গেল। ছেলেটির দাদামশায় জ্যাঠা আদি সব আত্মীয়স্বজন রসুলপুর জাঠান গ্রামে এল। বালক যশবীর সঙ্গে সঙ্গে সকলকে চিনে ফেলল। সবাইকার নাম ধরে কুশল প্রশ্ন করল। বালকের আত্মীয়রা তাকে অনেক প্রশ্ন করল। সে তাদের মনের মতো সব ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে দিল। বহেড়ি থেকে আসা লোকজনদের মধ্যে একজন ছিল যে ওই গাড়িতেই যাচ্ছিল যে গাড়ি থেকে শোভারাম পড়ে মারা যায়। সে জিজ্ঞাসা করল—'বল তো আমার নাম কি ?' যশবীর বলল— 'আমি তো তোমার নাম ভুলে গেছি, তবে আমার এ পর্যন্ত মনে আছে যে, যে সময় আমি গাড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলাম সেই সময় তুমিই আমাকে নিজের কোলে শুইয়ে রেখেছিলে।' এ কথা শুনে সে তো খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। সে সবাইকার সামনে এ কথা স্বীকার করল আর বলল—'বাস্তবে সত্যিই আমি একে গাড়ি থেকে পড়ে যাবার পর উঠিয়েছিলাম আর আমার কোলে শুইয়ে রেখেছিলাম।'

বালক যশবীরকে নিয়ে বহেড়ি গ্রামে যাবার পর রোহানা মিলস স্টেশনে এসে তাকে আগে আগে চলতে বলা হল। সে সবার আগে আগে চলে সোজা নিজেদের ঘরে এসে পৌঁছোল। সে সকলকে যথাযথ সম্বোধন করল। তখনই সে জেদ ধরল—'আমি এখন থেকে এখানেই আমার ঘরে

থাকব। কিছুতে ফিরে যাব না।'

এখন যশবীর দু জায়গাতেই থাকে। কখনো নিজের পূর্বজন্মের ঘরে ছেলে-মেয়েদের কাছে বহেড়িতে চলে যায় আবার কখনো রসুলপুর জাঠান গ্রামে ফিরে আসে।

আমি রসুলপুর জাঠানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলাম আর তাকে নিজে জিজ্ঞাসা করে উপরিউক্ত সব কথার উত্তর তার মুখ থেকেই শুনেছিলাম।

ভগবান শংকরাচার্য তথা অন্য অনেক যোগী-পুরুষের পর-শরীরে প্রবেশের ঘটনা আছে, কিন্তু তারা ছিলেন যোগী-পুরুষ। উপরিউক্ত ব্রাহ্মণ যুবক তো যোগী ছিল না, সে কী করে যশবীরের শরীরে প্রবেশ করল। এর উত্তর এই হতে পারে যে, যে-সবলোক অল্প বয়সে মারা যায় তাদের বহু কামনা-বাসনা অতৃপ্ত থেকে যায়। সে যদি কোনো খালি শরীর পেয়ে যায় তো তাতেই ঢুকে পড়ে। এই ব্যাপারই এখানে ঘটেছিল। যদিও এরকম ঘটনা খুব কমই ঘটে, কিন্তু একেবারেই যে ঘটবে না, তা বলা যায় না।

—— o ——

এক কঞ্জরের পুনর্জন্ম

সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্বান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীবিহারীলাল শাস্ত্রী একবার আমার বাড়ি পিলসুবায় এসেছিলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে রাম-নাম জপ, গঙ্গাস্নান এবং দান-পুণ্যাদির মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে পুনর্জন্মবাদের সত্যতা সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন। সেই সত্য ঘটনাটি হল—

বদায়ুন জেলার উঝানিতে এক ছোট শহর আছে। একবার কিছু রাজপুত ঠাকুর উঝানির পাশের কোনো গ্রাম থেকে গঙ্গা স্নান করার জন্যে সপরিবার যাচ্ছিল। নিজেদের গাড়িতে চেপে ওরা যাচ্ছিল। গ্রাম থেকে বেরিয়ে তারা যখন উঝানিতে পৌঁছায় তখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার জন্যে তারা উঝানির চৌমাথায় গাড়ি থামায়। বড় রাস্তার ধার বরাবর সে সময় কিছু কঞ্জর জাতির লোকেরা সেখানে তাঁবু গেড়ে বাস করছিল (কঞ্জর—যাযাবর জাতির লোক, উপজাতি বিশেষ)। এই রাজপুতদের সঙ্গে একটি ছোট বাচ্চাও ছিল, যার বয়স প্রায় পাঁচ বছর। ছেলেটি পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে সামনের ওই কঞ্জরদের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে যায় এবং সেখানে গিয়ে এক কঞ্জরী স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকতে থাকে। কঞ্জরদের ওই স্ত্রীলোকটি ছেলেটিকে এভাবে বিনা জানা-পরিচয়ে নিজের নাম ধরে ডাকতে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে যায়। স্ত্রীলোকটি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করে—'হ্যাঁরে ! তুই কাকে ডাকছিস ? তুই কে ?' উত্তরে ওই রাজপুতদের ছেলেটি বলে—'তুই আমাকে জানিস না ? তুই আমাকে ভুলে গেছিস ?' কঞ্জরী বলে—'তোকে আমি চিনি না ; তুই কে ? আর কোথায় থাকিস ?'

সেই ছেলেটি বললে—'আমি তোর স্বামী, তুই আমার বউ।' ছোট্ট একটা বাচ্চার মুখে এ রকম কথা শুনে কঞ্জরী স্ত্রীলোকটি খুব অবাক হয়ে

গেল যে, এ একটা চার-পাঁচ বছরের ছোট বাচ্চা আর আমার মতো বয়স্কা স্ত্রীকে নিজের বউ কী করে বলছে !

কঞ্জরী বললে—'হ্যাঁরে ! তুই আমার স্বামী কী করে হলি ? আমি জানিই না তুই কে ! আমার স্বামী তো কবেই মরে গেছে। এখন আমার স্বামী কোথা থেকে আসবে ? তুই এ কী কথা বলছিস ?'

উত্তরে ছেলেটি বললে—'তোর স্বামীর নাম তো মোহন সিং কঞ্জর ?' আরও বললে—'আমি আগের জন্মে তোর স্বামী মোহন সিং ছিলাম, আর এখন ওই ঠাকুরদের বংশে এসে জন্ম নিয়েছি।' ছেলেটি ওখানে বসে থাকা সব কঞ্জরদেরই চিনতে পারল। সে সেই সময়কার অনেক কথা বলতে আরম্ভ করল এবং অনেক গোপন কথাও যা তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, সবই বলে দিল। সব কথাই সত্যি ছিল। ফলে কঞ্জর আর তাদের মেয়েরা তার কথার সত্যতা স্বীকার করে নিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিল।

এদিকে যখন রাজপুত ঠাকুররা ছেলেটিকে ঘরে দেখতে না পেয়ে তার খোঁজ করতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে তাদের নজর কঞ্জরদের ঝুপড়ির উপর পড়ল। তারা দেখল ছেলেটি কঞ্জরদের কোলে চেপে রয়েছে। একজন কঞ্জর তাকে কোলে নিয়ে খুব আদর করছে। রাজপুতরা দৌড়ে সেখানে গেল এবং ছেলেটিকে নামিয়ে দেবার জন্য বলল। কঞ্জররা বললে—'না, এ ছেলে আমাদের, এ আমাদের মোহন সিংহ কঞ্জর ; একে আমরা আমাদের কাছে রাখব।' রাজপুতরা কঞ্জরদের অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করল এবং বলল—'ও আমাদের ছেলে, আমাদের ফেরত দাও।' কিন্তু লাখো বোঝানো সত্ত্বেও ছেলেটিকে তারা কিছুতেই দিতে চাইল না। এখন রাজপুত আর কঞ্জরদের মধ্যে পরস্পর কথা কাটাকাটি থেকে ঝগড়া, ঝগড়াও বেশ বেড়ে গেল। তা আর থামতে চায় না, তখন রাজপুত ঠাকুরেরা বাধ্য হয়ে থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে নালিশ জানাল যে—

'আমাদের ছেলেকে কঞ্জররা আটকে রেখেছে, দিচ্ছে না। ওদের কাছ থেকে আমাদের ছেলেটিকে এনে দিন।' পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে কঞ্জরদের ঠাকুরদের ছেলেকে ফেরত দিতে বলল। তাদের খুব করে বোঝাল, ভয়ও দেখাল, তবুও তারা ছেলেকে ফেরত দিতে রাজি হল না।

পুলিশ তখন কোনো উপায় না দেখে ছেলেটি কঞ্জরদের কাছ থেকে নিজেদের জিম্মায় নিয়ে উঝানির নাম করা ধনী লোক মাননীয় রায়বাহাদুর শ্রীবজ্রলাল ভদাবরের কাছে নিয়ে গেল। রাজপুত ঠাকুররা আর কঞ্জররাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল। যখন ওই ছেলেটিকে শ্রীযুক্ত ব্রজলালের নিকটে নিয়ে যাওয়া হল অমনি সে তাকে চিনে ফেলল। সে তখন তাঁর ভাল নাম ধরে ডেকে নমস্কার জানাল।

রায়বাহাদুর শ্রীব্রজলাল ভদাবর ওই ছোট্ট ছেলেটির মুখে ওই নাম শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। উনি অবাক হয়ে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কে ? আমি তো তোমাকে আগে কখনো দেখিনি, তুমি আমাকে কী করে জানলে ? তুমি আমাকে আগে কোথায় দেখেছ ?' তাতে বালকটি বলল—'রায়বাহাদুর সাহেব ! আমি পূর্বজন্মে আপনার কঞ্জর ছিলাম। আমার নাম মোহন সিং আর আমি তখন আপনার ঘরে এসে আপনার বাড়ির জন্যে খসখসের পর্দা তৈরি করে দিতাম।'

মাননীয় রায়বাহাদুর এ কথা শুনে একেবারে 'থ' হয়ে গেলেন। ছেলেটির প্রত্যেকটি কথা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি ! তিনি ছেলেটির কথা মেনে নিয়ে স্বীকার করলেন যে মোহন সিং কঞ্জর তার ঘরে খসখসের পর্দা তৈরি করত। রায়বাহাদুর সাহেব কঞ্জরদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছেলেটিকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে রাজপুত ঠাকুরদের ফিরিয়ে দিলেন।

মাননীয় রায়বাহাদুর শ্রীব্রজলাল ভদাবরজী আমাকে বলেছিলেন যে, এই গরিব কঞ্জরদের পরিবার থেকে ধনবান রাজপুত ব্রাহ্মণদের বংশে জন্ম নেওয়ার কারণ এই যে, ও আগের জন্মে কঞ্জর পরিবারের মধ্যেও এত

সংযমী আর সদাচারী ছিল যে ও কখনো মাছ মাংস খেত না। কখনো কোনো জীবহত্যা বা শিকার ও করত না। মা গঙ্গার উপর তার অগাধ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। কঞ্জর হলেও ও প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করত। আর নিত্য 'রাম-নাম' জপ করত। গরিব হওয়া সত্ত্বেও স্বল্প রোজগার থেকে কিছু কিছু জমিয়ে সে চারশো টাকা সঞ্চয় করে আমাকে দিয়ে গ্রামের লোকের জলকষ্ট দূর করার জন্য একটি কুয়ো তৈরি করে দিয়েছিল। নাম-জপ, গঙ্গা-স্নান, কূপ নির্মাণ এবং জীবের প্রতি দয়াভাবের জন্য তার এমন উচ্চবংশে শ্রীমানের কুলে জন্মলাভ সম্ভব হয়েছে।

—— ০ ——

মৃত্যুর পর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসা মানুষদের কথা

(১)
ভাঁগরী মনিহারিন

১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে কানপুরে সর্ববৈদিক শাখা সম্মেলন বসেছিল। সেই সময় কাশীর বিদ্বান পণ্ডিত শ্রীলালবিহারী মিশ্র মহাশয়ের (অধ্যাপক শ্রী গোয়েঙ্কা মহাবিদ্যালয়) সঙ্গে আমার পরলোক সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হচ্ছিল। তিনি তখন নিজের যাচাই করা পরলোক সম্বন্ধে কিছু ঘটনার কথা আমাকে শুনিয়েছিলেন।

সকলডিহা স্টেশন থেকে তিন ক্রোশ উত্তরে প্রভুপুর নামে এক গ্রাম আছে। ওই গ্রামে ভাঁগরী নামে এক মুসলমান স্ত্রীলোক বাস করত। ভাঁগরী ছিল কাঁচের চুড়ি বিক্রেতা এক মুসলমান মনিহারের স্ত্রী। একবার ভাঁগরীর পাড়ার একটি মেয়ের অসুখ করেছিল। ভাঁগরী তার অসুখের খবর পেয়ে তাকে দেখতে যায়। তাকে দেখে যেই সে ঘরে ফিরে আসে অমনি সে মারা যায়। নিজের ঘর থেকে ওই অসুস্থ মেয়েটিকে দেখতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ ছিল, তার কোনো রকমের কোনো অসুখ ছিল না।

ভাঁগরী যেহেতু মুসলমানের মেয়ে তাই তাকে মুসলমানী নিয়ম অনুযায়ী কবর দেবার জন্যে জঙ্গলের ধারের কবরখানায় গর্ত খোঁড়া হল। ভাঁগরীর মৃতদেহ কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল কিন্তু মৃতদেহ যখন কবরের ভিতরে শোয়ানোর জন্য তোলা হচ্ছিল তখন সে একেবারে জীবিত হয়ে উঠল। তার মুখ থেকে শব্দ বার হচ্ছিল কিন্তু কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। সে ইশারায় তার মুখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে দিতে বলে। যখন তার মুখ থেকে কাপড়টা সরানো হল তখন সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখল যে তার মাথাটা আগে

যেমন ছিল তেমনটি নেই—তার মাথায় তিন জায়গায় তিনটে পোড়া দাগের চিহ্ন—যেন কেউ ত্রিশূল গরম করে তার মাথায় দাগ দিয়ে দিয়েছে। তার চুলগুলোও খানিকটা পুড়ে গিয়েছে। এরপর ভাঁগরী যতদিন জীবিত ছিল ততদিন ওই পোড়া দাগ আর চুলগুলো একভাবেই ছিল। তার মাথায় ওই ত্রিশূলের চিহ্নটিও মৃত্যুকাল পর্যন্ত বরাবর একই রকম ছিল।

লোকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ভাঁগরী বলত—'আমি তো সম্পূর্ণ সুস্থই ছিলাম, আমার কোনো রোগই ছিল না। হঠাৎ ওই দিন আমার সামনে দুটো লোক এসে আমাকে ধরে নিয়ে অনেক দূরে নিয়ে গেল। ওরা আমাকে যেখানে নিয়ে গেল সেখানে দেখলাম একজায়গায় অনেক লোক মিলে একটা সভা করছে। একটি উঁচু সিংহাসনের উপরে একজন সুন্দর তেজস্বী লোক বসে আছে। ওই তেজস্বী পুরুষটি ওই দুজনকে, যারা আমাকে ধরে নিয়ে তার সামনে হাজির করেছিল, খুব ধমকিয়ে বললেন—'তোমরা একে কেন এখানে নিয়ে এলে ? এর মৃত্যু তো এখন হবার নয়। এর আয়ু তো এখনও চোদ্দ বছর বাকি আছে। তোমাদের তো এর প্রতিবেশী যে মেয়েটি অসুস্থ রয়েছে, তাকে নিয়ে আসতে বলেছিলাম। এই মেয়েটা খুব পাপাত্মা। এ নিজের চোখে নিজের দু-মেয়ের মৃত্যু দেখে দুঃখ ভোগ করবে, তারপর ও মরবে। তোমরা একে বৃথা কষ্ট দিলে। যাইহোক এর মঙ্গলের জন্যে এর মাথায় ত্রিশূলের দাগ দিয়ে দাও যাতে ও বাঁচার পরে এখানে আসার কথা মনে রাখে আর পাপ থেকে বাঁচে।' এরপর তারা আমার মাথায় ত্রিশূল পুড়িয়ে দাগ কেটে দিল আর তাতে চুল-গুলো পুড়ে গেল।

ভাঁগরী যে চারটি কথা বলেছিল তা সত্য প্রমাণিত হয়। তার মাথায় যমদূতের চিহ্নিত ত্রিশূলের দাগ আজীবন ছিল, যে সময় ভাঁগরী বেঁচে ওঠে ঠিক সেই সময়েই ভাঁগরীদের প্রতিবেশী সেই রুগ্ন মেয়েটি মারা যায়। চোদ্দো বছরের ভিতরে তার চোখের সামনেই দু-দুটো মেয়ে মারা যায় এবং চোদ্দো বছর বেঁচে থাকার পর তারও মৃত্যু হয়।

(২)
শ্রীরক্ষামলজী

সন ১৯৫৪ সালের কথা। একবার পরম বৈরাগী সাধু শ্রীমৎরামচন্দ্র মহারাজ কৃপাপূর্বক পিলখুয়ায় আমার বাড়িতে এসেছিলেন। একদিন উনি কথার মাঝে প্রসঙ্গক্রমে পরলোক সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই ঘরের একটি ঘটনার কথা শুনিয়েছিলেন। তা এইরকম—

'১৯৪৬ সালের কথা। আমার বাবা শ্রীরক্ষামলজী নানকানাসাহেবে থাকতেন। ওখানেই আমাদের বাড়ি ছিল। আমার বাবা প্রত্যেকদিন খুব সকালে নিয়মমতো ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠতেন। হঠাৎ একদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠলেন না। আমরা চিন্তিত মনে তাঁর ঘরে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি তিনি পালঙ্কে শুয়ে তখনও ঘুমোচ্ছেন। আমরা তাঁকে জোরে ডাকলাম কিন্তু কোনো সাড়া পেলাম না। খাটের কাছে গিয়ে তাঁকে লক্ষ করলাম এবং তাঁর গায়ে হাত দিয়ে বুঝলাম তাঁর শরীর যেন মৃতদেহের মতো একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে। আমরা খুব ঘাবড়ে গেলাম। দৌড়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে তাকে সঙ্গে করে ধরে নিয়ে এলাম। ডাক্তারবাবু বাবাকে খুব ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে বললেন—'ইনি খুবই দুর্বল।' সেই সময় বাবার সারা শরীর ঘামে জবজবে হয়ে গিয়েছিল এবং দেহ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ বাদে যে করে হোক বাবার জ্ঞান ফিরে এল। জ্ঞান ফিরে আসার পর বাবা আমাদের বললেন—'সকালবেলা প্রায় পাঁচটার সময় দুজন যমদূত আমাকে নিতে এসেছিল।' তারা আমাকে বলে—'তুমি আমাদের সঙ্গে চল।' আমি ওদের দুজনের সঙ্গে চলে গেলাম। অনেকদূর গিয়ে দেখলাম একটা বিরাট ময়দান ; সেখানে একজন লোক বসে রয়েছে। সে এই যমদূত দুজনকে দেখে বলে উঠল 'ওকে এখানে এনো না। একে

আনার জন্যে তোমাদের কখন বললাম ? যার কথা বললাম, সে তো আর এক রক্ষামল, রক্ষামল আগরওয়াল, যে এর পাড়াতেই থাকে। তোমরা তাড়াতাড়ি যাও, গিয়ে ওই রক্ষামলকে নিয়ে এসো আর একে এক্ষুনি ফেরত দিয়ে এসো।' যমদূত দুজন আমাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে ছেড়ে দিয়ে গেল। তখন থেকেই আমার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমরা এই ঘটনা কতদূর সত্যি জানবার জন্যে তখনই ছুটে আমাদের পাড়ার রক্ষামল আগরওয়ালের খোঁজ নিতে গেলাম। গিয়ে জানতে পারলাম লালা রক্ষামল আগরওয়াল রাত্রে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল ; তার কোনো রোগ-জ্বালা ছিল না, খেয়েদেয়ে শুয়েছিল। কিন্তু সকাল ৫টা ২৫ মিনিটে দেখা গেল সে মরে পড়ে আছে।

(৩)

অহীরিন শাকওয়ালি

আমাদের পিলসুবার কাছে এক গ্রামে এক বুড়ি অহীরিন বাস করত। সে ফল, শাকসবজি বিক্রি করে সংসার চালাত। আমার মায়ের সঙ্গে তার খুব ভাব ছিল। যদি কোনো দিন ফল বেচতে এদিকে আসত তো আমাদের ঘরে সে অবশ্যই একবার দেখা করত। একদিন হঠাৎ সে মারা গেল। ঘরের লোকজন তাকে বাঁশের মাচায় বেঁধে নিয়ে গিয়ে শ্মশানে চিতার উপর শুইয়ে দিল। চিতায় যে মুহূর্তে আগুন দিতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে সে নড়েচড়ে উঠল আর শব্দ করতে লাগল। এই দেখে সবাই তো অবাক আর ভয় পেয়ে গেল। বুড়ি তো বেঁচে উঠল। পরে সে তার মরার পরের ঘটনা, পরলোক সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতার অনেক কথা বলেছিল। আমরাও তাকে আমাদের ঘরে ডেকে নিয়ে এসে মায়ের সামনে বসে তাকে অনেক কথা বলতে শুনেছি।

সে বলেছিল—'আমার কোনো অসুখ ছিল না, সুস্থই ছিলাম। ওই দিন

আমার সামনে লম্বা-চওড়া ভয়ংকর চেহারার কালো কালো দুটি লোক এসে দাঁড়াল আর আমাকে ধরে এক জায়গায় নিয়ে গেল। সেখানে দেখতে পেলাম বিরাট এক রাজসভা। সুন্দর সিংহাসনের উপরে এক অতি বৃদ্ধ লোক বসে আছেন ; তাঁর মাথায় রুপোর মতো সাদা সাদা চুল। তাঁর হাতে একটা খুব বড় খাতা আর চারিদিকে ছড়ানো কাগজের স্তূপ। তিনি আমাকে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওই দূতদের বললেন—"ওহো তোমরা একে কেন নিয়ে এলে ? একে তাড়াতাড়ি নীচে দিয়ে এস। একে ভুল করে নিয়ে এসেছ।" তারা তখন আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসে এখানে ছেড়ে দিয়ে গেল। যমদূতের লাঠির ঘায়ে আজও আমার শরীরে ব্যথা লেগে আছে।'

(৪)

শ্রীবিশ্বম্ভরনাথজী বাজাজ

১৯৫৭ সালের ২০ ডিসেম্বর দিল্লির দৈনিক পত্রিকা 'হিন্দুস্থানএ' একটি খবর ছাপা হয়েছিল। মুরৈনা নামক গ্রামের ঘটনাটি নিম্নরূপ—

যদিও এ কথা বিশ্বাস হওয়া কঠিন কিন্তু ঘটনাটি সত্য। এখানকার এক ব্যবসায়ী বিশ্বম্ভর বাজাজ, তার বয়স ৭৫ বৎসর। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে রোগ ভোগ করছিলেন। ১৬ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বেঁচে ওঠেন। তাঁর জীবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের আর এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

ঘটনাটি এরূপ। ১৬ ডিসেম্বর শ্রীবিশ্বম্ভরনাথ বাজাজের অবস্থা খুব খারাপ হতে থাকে। আস্তে আস্তে ওঁর দেহ থেকে প্রাণের সব লক্ষণ লোপ পেতে থাকে। ক্রমে তাঁর নাড়ির গতি, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। শরীর একেবারে ঠাণ্ডা হিম হয়ে যায়। ফলে তাঁর আত্মীয়স্বজন তার দেহ মাটিতে শুইয়ে দেয়। আর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সব ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করে। কিন্তু প্রায়

আধঘন্টা পরই সে হঠাৎ উঠে বসে আর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে— 'এ সব কী হচ্ছে ?' সে তখন জানতে পারে যে সে মরে গিয়েছিল আর তাই তার অন্তেষ্টিক্রিয়ার সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে তখন সে সকলকে আশ্বাস দিয়ে বলে—'আমি মরিনি।' তারপর বলে—'কিছু লোক তাঁকে আকাশে উঠিয়ে ষাঁড়ের ওপর বসা এক দিব্যপুরুষের সামনে নিয়ে যায়। সেই দিব্য-পুরুষ বাহকদের ধমক দিয়ে বলে—'এ লোককে এখনি পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়ে এসো। একে আনতে বলিনি, ওই শহরেই আর এক ব্যক্তির কথা বলেছিলাম।' এরপর ওরা আমাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে গেল।

তিনি যখন এই ঘটনার কথা শোনাচ্ছিলেন তখন সকলে আরও আশ্চর্য হল এই শুনে যে বিশ্বম্ভর বাজাজের চেতনা ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ওই সময়েই ওই শহরেরই চল্লিশ বৎসর বয়স্ক আর একজন ব্যবসায়ী শ্রীগ্যাসিরাম, যার কোনো রোগ-বালাই ছিল না, হঠাৎ হৃদযন্ত্রের গতি বন্ধ হয়ে মারা যায়।

এই দৈব ঘটনার কথা শহরের চারিদিকে আলোচিত হচ্ছে।

(৫)

জানকী খটিকিন

১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসের ১০ মে সংখ্যায় 'শ্রীমারুতি সঞ্জীবনী' নামক মাসিক পত্রিকায় এই খবরটি ছাপা হয়েছিল—'পাঁচিশ বছরও হয়নি, এই 'নুনহড়' বস্তিতে জানকী নামে এক মহিলা বাস করত। সে জাতিতে ছিল খটিক। মাসাধিক কাল অসুস্থ থাকার পর সে একদিন মরণাপন্ন হয়ে পড়লে, অবস্থা বুঝে তাকে মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হয় আর তখনই সে হেঁচকি উঠে মারা যায়। সে এই গাঁয়েরই মেয়ে, উত্তরাধিকার সূত্রে বাপের বাড়ির জমিজমা পেয়ে এখানেই বাস করছিল। তার স্বামী সীতারাম খটিকও এখানেই থাকত। এই ঘটনার সময় সীতারাম জীবিত ছিল। অধিকাংশ গ্রামের লোকই জানকীকে জুনুকিয়া বলে ডাকত।

মৃত্যুর পর তাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্যে বাঁশের মাচা বাঁধা হচ্ছিল। সীতারাম তখন খুব বুড়ো, হাঁপানিতে ভুগত। লোকজন ডাকাডাকি করতে করতে বেশ সময় চলে গেল। লোকজন যখন বাঁশের মাচা বাঁধছে ঠিক সেই সময় ঘরের ভিতরে যেখানে জানকীকে শোয়ানো হয়েছিল, সেই ঘর থেকে জানকীর গোঙানির আওয়াজ শোনা গেল। কী ব্যাপার দেখার জন্যে লোকজন ছুটে মৃতদেহের কাছে গেল। জানকীকে কাঁদতে দেখে আমরা তাকে জিজ্ঞাস করাতে ও বলতে লাগল, তার কোমরে খুব ব্যথা, আর তাকে খুব উঁচু থেকে আছড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেই কথা বলতে গিয়ে ও আরও বলে যে, 'এখান থেকে আমাকে দুটো কালো কালো লোক টেনে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এক জায়গায় নিয়ে গেল। আমি খুব চিৎকার করে কাঁদছিলাম কিন্তু ওদের এতটুকু দয়া হল না, সেখানে পৌঁছানোর পর দেখলাম সাদা ধবধবে দাড়িওয়ালা একজন বুড়ো লোক বসে আছে। ওর চারপাশে গাদা গাদা বস্তা নামানো রয়েছে। তার সামনে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে দেখেই বললে—'একে কেন এনেছ ? আর একজন জুনুকিয়া আছে, তাকে নিয়ে এস।' এই কথা শুনে ওই লোকগুলো আমাকে নীচে আছড়ে ফেলে দিলে আর তার ফলে আমার কোমর ভেঙে গেছে। আমি বেঁচে গেছি কিন্তু আধমরা হয়ে গেছি।' তার এই সব কথা শুনে লোকেরা নিজেদের মধ্যে পরস্পর তর্কবিতর্ক করতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, ঠিক তার দু-ঘন্টা পর স্থানীয় আর একজন রাজপুত লোধ বুড়ি জুনুকিয়া মারা গিয়েছিল। এই ঘটনার পর জুনুকিয়া খটিকিন আরও দশ বৎসর বেঁচে ছিল।

(৬)

শ্রীরুদ্র দত্ত

দিল্লি থেকে প্রকাশিত এক দৈনিক পত্রিকা 'নবভারত টাইমস্' এর ৯-১-১৯৬০ সালের সংখ্যায় নিম্নের ঘটনাটি ছাপা হয়েছিল—

'নৈনিতাল' ৮ জানুয়ারি। গাড়োয়াল জেলার রানাঘাট এর কাছে ছুণ্ডি গাঁয়ের বাসিন্দা শ্রীরুদ্র দত্তকে মৃত বলে ঘোষণা করার কিছু পর সে পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠে। সে সময়ে তার আত্মীয়স্বজনেরা খুব কান্নাকাটি করছিল আর তার দাহ-সংকারের জন্যে তৈরি হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়েই মরার দেহে জীবনের চিহ্ন দেখা গেল। মৃত রুদ্র দত্ত চোখ খুলে চাইল। সকলে অবাক হয়ে তাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করায় সে তার পরলোকগমনের কথা আত্মীয়স্বজন এবং গাঁয়ের লোকদের সবিস্তারে শোনায়। রুদ্র দত্ত বলেছিল—'আমাকে হনুমানজীর একটি মন্দির তৈরি করবার আদেশ হয়েছে।' রুদ্র দত্ত বেশ কিছুদিন থেকেই অসুস্থ ছিল, এখন সুস্থ হয়ে গেছে আর পরলোকের দৈব আদেশ অনুসারে শ্রীশ্রীহনুমানজীর একটি মন্দির তৈরি করতে আরম্ভ করেছে।

(৭)

তুলসী পিসি

মীরাটের দৈনিক পত্রিকা 'প্রভাত' ৪ মার্চ ১৯৬৬ তে একটি ঘটনার কথা ছাপা হয়েছিল তা নিম্নরূপ—

কানপুর। তুলসী পিসি মৃত্যুর সঙ্গে ছলনা করেছিল না মৃত্যু তার সঙ্গে ছলনা করেছিল বলা কঠিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুলসী পিসিকে মরতে হয়েছিল।

তুলসী পিসি এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে এক গ্রামে বাস করত। পূজাপাঠ তথা ধার্মিক মহিলারূপে তার নাম ডাক ছিল। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি

রাত্রি ১০টার সময় তার মৃত্যু হয়, আর পরের দিন যখন তাকে চিতার উপর শোয়ানো হচ্ছিল তখন উঠে বসে এবং বলে—'যমদূত যখন আমাকে ভগবানের সামনে নিয়ে গেল তখন তিনি দূতদের ধমকে বলেন যে, এর এখনও সময় হয়নি, একে কেন এখানে নিয়ে এলে ? তখন যমদূতেরা আমাকে ফিরিয়ে এনে এখানে ছেড়ে দিয়ে গেল।' তিনি আরও বলেন যে—'ভগবানের সিংহাসনটা এত চকচকে যে তার ঝকমকানিতে আমি তাঁকে দেখতে পেলাম না।' তুলসী পিসিকে ঢাক ঢোল পিটিয়ে সানাই বাজিয়ে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

খবরে এও ছাপা হয়েছিল যে স্বর্গ থেকে ফেরা এই দেবীকে দর্শন করতে ওই গ্রামে হাজার হাজার লোক ভিড় করছে। তুলসী দেবী একটা খাটের উপর হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে রাম-নাম জপ করছেন আর মাঝে মাঝে দর্শনার্থীদের আশীর্বাদ ছুড়ে দিচ্ছেন। ঠিক শিবরাত্রির দিন হঠাৎ তিনি বলে ওঠেন—'এখন আমার অন্তিম সময় এসে গেছে।' আর তৎক্ষণাৎ তার প্রাণবিয়োগ হয়ে যায়। তার অন্তেষ্টিক্রিয়ায় হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়।

(৮)

মিঃ টেমস্ (ইংরেজ) এর স্বর্গ থেকে প্রত্যাগমন

১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা। একবার পিলখুবায় আমাদের বাড়িতে ভারতের প্রখ্যাত আর্যসমাজের সন্ন্যাসী স্বামী সত্যানন্দ মহারাজ এসেছিলেন। স্বামীজীর আচার-আচরণ বৈদিক ধর্মসম্মত দেখে আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। আমি যখন মহারাজের এরকম বিস্ময়কর পরিবর্তনের রহস্য জিজ্ঞাসা করি তখন তিনি বলেছিলেন—'রামশরণজী ! আমি প্রথমদিকে একজন কট্টর আর্যপন্থী ছিলাম। তখন পরলোক, যমরাজ, ধর্মরাজ, যমদূত, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি কিছুই বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু যেদিন থেকে মি. টেমস্ (ইংরেজ)-এর মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ তথা

পরলোক, যমরাজ, ধর্মরাজ, যমদূত, স্বর্গ-নরক দেখার বর্ণনা তার নিজের লেখা বই-এ পড়লাম সেদিন থেকে আমার পরলোক বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছে আর পুরাণে বর্ণিত সমস্ত কথা সত্য মেনে নিয়ে সনাতন হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে আসতে আমাকে বাধ্য করেছে।' তারপর আমি জিজ্ঞাসা করাতে আর্যসমাজী সেই সন্ন্যাসী বলেছিলেন যে মি. টেমস্ তার বই-এ লিখেছেন—

'আমি আগে কোনোদিন একথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলাম না যে লোকে মরে গেলে যমদূত ধরে নিয়ে যায় আর তাকে ধর্মরাজের সামনে হাজির করে। আর সেখানে সকলকে আপন আপন পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করতে হয়। এসব কথা আমি সম্পূর্ণ গল্প এবং ডাহা মিথ্যা বলে মনে করতাম। এ সব কথায় আমার কোনোদিন এতটুকুও বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু এখন বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ একবারের কথা, আমি খুব কঠিন রোগে অসুস্থ হয়ে পড়ি। হঠাৎ আমার নাড়ির গতি থেমে যায়, আমি মারা যাই। বাড়ির লোকজন আমাকে মৃত মনে করে খ্রিস্টিয় প্রথায় আমার সৎকারের বন্দোবস্ত আরম্ভ করে। এদিকে মরার পর আমি দেখলাম, আমাকে কয়েকটা যমদূত ধরে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে চলে গেল আর সেখানে আমাকে যমরাজের সামনে হাজির করল। আমি দেখলাম যমরাজের রাজসভায় বড় বড় বিচারশালা রয়েছে। সেখানে ঝকঝকে একটা উঁচু সিংহাসন, তার ওপর একজন দৈবপুরুষ বিরাজমান ; যিনি আমাকে দেখেই ওই দূতদের বললেন—'ওহে ! এ টেমস্ নয়, যাকে তোমাদের আনতে বলেছিলাম। একে তোমরা বৃথা নিয়ে এলে ; এ তো আর এক টেমস্। যাও, একে তোমরা সেখানে ছেড়ে দিয়ে এসো আর যে টেমসের কথা বলেছিলাম তাকে তাড়াতাড়ি ধরে আনো। তারা আমাকে ছেড়ে দিয়ে গেল আর ঠিক ওই সময়ে আমি বেঁচে উঠলাম আর আমার পাড়াতে আমার নামের আর একজন টেমস্ (ইংরেজ) ছিল, যে সেদিন পর্যন্ত সুস্থ ছিল, হঠাৎ মরে গেল। পরলোকে আমি এও দেখেছিলাম যে সেখানে বড় বড় নরককুণ্ড রয়েছে যেখানে অনেককে ঢোকানো হচ্ছে,

কাউকে আগুনে পোড়ানো হচ্ছে। সারি সারি দাঁড় করিয়ে সবাইকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। এসব স্বচক্ষে দেখে এখন আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে যে যারা বলে স্বর্গ-নরক বলে কিছু নেই, তাদের সব কথাই আগাগোড়া ভুল। এখন আমি স্বয়ং হিন্দুদের শাস্ত্র-পুরাণে বর্ণিত এইসব কথার জীবন্ত প্রমাণ। পরলোকদর্শন করে এসে আমি খ্রিস্ট ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু সনাতন ধর্ম গ্রহণ করেছি। এখন আমি হিন্দু-শাস্ত্রে বলা নীতিবিধি অনুসারে নিয়মিতভাবে সমস্ত নিত্যকর্ম করছি এবং রামায়ণ, গীতা নিত্য পাঠ করছি।'

মি. টেমস্ (ইংরেজ)-এর নিজস্ব অভিজ্ঞতার এই ঘটনার বর্ণনা করার পর স্বামী সত্যানন্দ বললেন—'রামশরণজী ! এক খ্রিস্টানের এই ভাবনার পরিবর্তন আমাকে পুরোনো আর্যপন্থী ভাবধারা ত্যাগ করে সনাতন ধর্মের আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। এখন আমারও মি. টেমসের মতো শাস্ত্র-পুরাণে পূর্ণ আস্থা জন্মেছে।'

——— o ———

পুনর্জন্মে যোনি-পরিবর্তন

গত জন্মে স্কুল মাস্টার, পরে গোরু, বর্তমানে এক বালিকার কথা

(১)

আগের জন্মে আমি স্কুল মাস্টার ছিলাম, পরে গোরু হয়ে জন্মাই আর এ জন্মে এক বালিকা হয়ে জন্মেছি।

দিল্লির দৈনিক পত্রিকা 'হিন্দুস্থান' ১৯৬৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় এই পুনর্জন্মের ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছিল—

রোহতক। গোল পুরবাঁপুরে চঞ্চলকুমারী নিজের পূর্বজন্মের ঘটনা বলতে গিয়ে মা-বাবা ও গাঁয়ের লোকেদের মধ্যে এক আলোড়ন তুলে দিয়েছে। কিছুদিন আগে তার মা প্রতিবেশীদের ঘরে সৎসঙ্গ শুনতে গিয়েছিল। যখন নাম-গান শুনে সে ঘরে ফিরে আসে তখন চঞ্চলকুমারী তাকে জিজ্ঞাসা করে—'মা, কী শুনে এলে ?' মা বললে—'আমার কিছু মনে নেই।' মেয়ে বললে—'মা ! তোমার তো এই কথা মনে নেই কিন্তু আমার তো আগের জন্মের সব কথা মনে আছে।'

নয় বছরের মেয়ে চঞ্চলকুমারী পূর্বজন্মের কথা শোনাতে গিয়ে বলেছিল—'আগের জন্মে আমি পানিপথের এক স্কুলে মাস্টার ছিলাম। আমার নাম ছিল কৃষ্ণলাল। আমার বাবার নাম ছিল রামপিয়ারা নাগপাল। ২৫ বছর বয়সে আমি পেটের রোগে মারা যাই। বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল কিন্তু বিয়ে হয়নি। আমার ভাইদের নাম, আমার মায়ের নাম সব আমার মনে আছে।'

চঞ্চলকুমারী বলেছিল, কৃষ্ণলাল মারা যাবার পর সে গোরু হয়ে জন্ম নিয়েছিল। ওই গোরুটি এক মুসলমান পরিবারে থাকত। গোরুটা কম দুধ দিত তাই তার মালিক একদিন তাকে লাঠি দিয়ে এমন মার মারে যে গোরুটা জখম হয়ে মারা যায়। গোরুটা মরার পর পুরবাঁপুরে গ্রামে তোমার

ঘরে এই আমি চঞ্চলকুমারী হয়ে জন্ম নিয়েছি। চঞ্চলকুমারী জেদ করায় তার ঘরের লোকজন গত সপ্তাহে তাকে পানিপথ নিয়ে গিয়েছিল। পানিপথে সে তার স্কুলের বিল্ডিং চিনতে পারে এবং নিজের পুরোনো ঘরও চিনে সকলকে দেখায়, এ অঞ্চলের কিছু লোকেরা জানায় যে এই গলিতে কয়েক বছর আগে এক স্কুল মাস্টার পেটের যন্ত্রণায় মারা যায়। চঞ্চলকুমারীর আগের জন্মের আত্মীয়স্বজনরা এখন রোজগারের জন্য পানিপথ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে।

(২)

এক নাপিতের মেয়ের পূর্বজন্মের ঘটনার বর্ণনা

মুজফ্‌ফরনগরে আমার বোন সাবিত্রীর বিয়ে হয়। আমি অনেক-দিন আগে সেখানে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন মুজফ্‌ফরনগরের বিখ্যাত রায়বাহাদূর শ্রীজগদীশ প্রসাদ এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়।

মাননীয় কুমারসাহেব আমাকে বলেছিলেন—'আমার এখানে নাপিতের একটি মেয়ে থাকে। সে আগের জন্মের সব কথা বলে দিচ্ছে।' আমি সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা জানালাম। কুমারসাহেব সঙ্গে সঙ্গে তার লোকজনদের আমার সঙ্গে দিলেন এবং তারা আমাকে ধুমসিংহ পরামানিকের বাড়ি নিয়ে গেল। মেয়েটির নাম গীতারানি। তার বয়স চার বছরের কাছাকাছি। আমি তাকে আমার কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—

আমি—'মা তোমার নাম কি ?'

গীতারানি—'আমার নাম গীতারানি।'

আমি—'তোমার গত জন্মের কথা মনে আছে ? তখন তুমি কোথায় থাকতে ?'

গীতারানি—'আমি শ্যামলী গাঁয়ে থাকতাম। তখন আমার নাম ছিল

রাজকুমার।'

আমি—'সেখানে তুমি কি করতে ?'

গীতারানি—'দোকান চালাতাম।'

আমি—'কীসের দোকান ?'

গীতারানি—'আমি ওখানে ফলের দোকান চালাতাম।'

আমি—'ওখানে তোমার স্ত্রীও ছিল তো ?'

গীতারানি—'হ্যাঁ, আমার স্ত্রীও ছিল।'

আমি—'শুনেছি তুমি ওখানে তোমার এক ছেলের কথা বলেছ ?'

গীতারানি—'আমার একটা ছেলেও ছিল।'

ওর সঙ্গে আমার আরও অনেক কথা হয়েছিল। কিন্তু বাড়ির লোকেরা এ সমস্ত কথায় গুরুত্ব দিতে কিংবা প্রচার করতে অসম্মত ছিলেন। সেজন্য আমিও এই ঘটনাটি জনসমক্ষে জানাবার কোনো চেষ্টা করিনি।

এক হাজার বছর প্রেতযোনি ভোগ করা এক পীর সুলেমানের কাহিনী

এক হাজার বছর প্রেত হয়ে থাকা এক মুসলমান পীর সুলেমান শিখদের পূজ্যপাদ সন্ত শ্রীমৎ ঈশ্বরসিংহ মহারাজের কৃপায় ৫ আগস্ট ১৯৬৮ সালে এক শিখ-পরিবারে মনুষ্যজন্ম লাভ করে এবং একজন ছাত্র মনমোহন সিংহের শরীরে প্রবেশ করে পরলোক সম্বন্ধে তার নিজের চোখে দেখা আশ্চর্য আশ্চর্য যেসব ঘটনার বর্ণনা করেছে, সেসব খুবই রোমাঞ্চকর এবং সেগুলি আমাদের শাস্ত্র-পুরাণে পরলোক সম্বন্ধে যেসকল কথা বলা হয়েছে সে সব যে নিঃসন্দেহে সত্যি তা প্রমাণ করে।

পূজনীয় সন্ত মহারাজের সেবায় যিনি সর্বদাই উপস্থিত থাকতেন সেই মাস্টার শ্রীরাজেন্দ্র সিংহ আমাকে বলেছিলেন—'আমার ছাত্র মনমোহন সিংহকে তার নিজের ঘরে একান্তে বসিয়ে তার দেহে ভর করা এক হাজার বছরের এক মুসলমান পীর প্রেতকে পরলোক সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন করেছিলাম এবং সে আমাকে যে উত্তর দিয়েছিল তা হুবহু এই রকম—

শ্রীরাজেন্দ্র সিংহ—'তোমার নাম কি ?'

প্রেত—'আমার নাম সুলেমান।'

প্রশ্ন—'তুমি হিন্দুস্থানে কী করে এলে ?'

উত্তর—'এক মুসলমান বাদশাহ্ হিন্দুস্থান লুট করবার জন্যে এখানে এসেছিল। আমি ওই বাদশাহের সৈন্যদের সঙ্গে এখানে এসেছিলাম। তারা তো এই দেশ লুট করে নিজের মুলুকে চলে গেল, কিন্তু আমি এই হিন্দুস্থানেই রয়ে গেলাম। এখানে আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করে সাহারানপুর জেলার মুঘলখেড়া নামে এক গ্রামে বাস করতে থাকি। ওই স্ত্রীর গর্ভে আমার দুই ছেলে আর দুই মেয়ে—মোট চার ছেলেমেয়ে

হয়েছিল। আমাদের ওখানে তখন একজন হিন্দু সাধু থাকত, যে এখন এই মনমোহন সিংহ নামে আপনার সামনে বসে আছে। ওই সাধু আংটি, কবচ ইত্যাদি লোককে দিত, আর লোককে মিথ্যা বুজরুকি দেখিয়ে ঠকাত। আমার এক সুন্দরী যুবতী মেয়ে ছিল, তার সঙ্গে ওই ভণ্ড সাধু অবৈধ ভাবে মেলামেশা করত আর সেই অবৈধ সম্পর্কের কথা আমি জেনে ফেলি। তখন আমি অনেক চেষ্টা করেছি যাতে এই অবৈধ সম্পর্ক ভেঙে যায়। আমি নিজে ওদের অনেক বুঝিয়েছি এবং তখনকার আইন অনুযায়ীও ওদের সম্পর্ক ছেদ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু কোনো ফল হয়নি। তারপর থেকে আমার মনে এমন গভীর হতাশা দেখা দিল যে আমি ঈশ্বর খোদাতালার কাছে প্রার্থনা করলাম যে, যে কোনো প্রকারে আমি যেন এর বদলা নিতে পারি। হে আল্লা ! তুমি আমার এই ইচ্ছা পূরণ করো। এ রকম নানা চিন্তা করতে করতে কিছুদিন পর আমি মারা গেলাম।'

আমি বললাম—'সুলেমান ! তুমি মৃত্যুর পরের ঘটনা আমাকে বলো। তুমি কী করে মরলে আর সেই সময় তোমার কী কী হয়েছিল ?'

সুলেমান বললে—'যখন আমার মৃত্যুর সময় এল তখন আমার চোখ থেকে জল গড়াতে লাগল। কথা বলা একদম বন্ধ হয়ে গেল। সেই সময় আমাকে নিয়ে যেতে চারজন যমদূত এসেছিল। তারা এসে আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে গেল আর আমাকে বেদম পিটুতে লাগল। যমদূতগুলো ভয়ঙ্কর চেহারার দেখতে। আমি ওদের দেখে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি মুখ নাড়ছিলাম কিন্তু কোনো আওয়াজ বেরুচ্ছিল না। যমদূতদের শরীরগুলো মানুষের মতো স্থূল নয়, তাদের অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছিল না, শুধু আমিই দেখতে পাচ্ছিলাম। মরার সময় খুব কষ্ট হয়েছিল। যদি একটা তীক্ষ্ণ দীর্ঘ সূচের ন্যায় কন্টক বনে একটি মখমলের পাতলা কাপড় রেখে সেটিকে টানা হলে যেমন কাপড়ের এক-একটি সূতো আলাদা হয়ে যায়, তেমনই আমার জীবাত্মার অবস্থা হয়েছিল। মরার সময় আমার এত কষ্ট হয়েছিল যে তা আমি বলে বোঝাতে পারব না।'

প্রশ্ন—'যমরাজের দূত যখন তোমাকে ধর্মরাজের সামনে নিয়ে গেল

তখন রাস্তায় তোমার কী অবস্থা হল ?'

উত্তর—'যমরাজের দূতেরা যখন আমার শরীর থেকে প্রাণটা বার করে দিল তখন আমার সূক্ষ্ম আত্মা, যা লোকেরা চোখে দেখতে পায় না, তাকে মারতে মারতে ওরা নিয়ে গেল। কম করে এক বছর লেগেছিল আমাকে যমরাজের কাছে নিয়ে হাজির করতে।'

প্রশ্ন—'এখন তুমি বল— তোমাকে যখন ধর্মরাজের কাছে হাজির করা হল তখন তোমার প্রতি কী রকম ব্যবহার করা হয়েছিল ?'

উত্তর—'ধর্মরাজের কাছে পৌঁছানোর পর চিত্রগুপ্ত বলে এক দেবদূত আমার জীবনে পাপ-পুণ্য যত ছিল প্রত্যেকটির হিসাব-কিতাব ধর্মরাজকে পড়ে শুনিয়ে দিল। ধর্মরাজ সব শুনে আমাকে বললেন—'তোমাকে পাপকাজের ফলস্বরূপ কুম্ভীপাক নরকে ফেলে দেওয়া হবে, আর ওই নরকভোগের পর তোমাকে এক হাজার বছর প্রেত হয়ে থাকতে হবে। তোমার ওই প্রেতজন্মের এক হাজার বছর পুরো হয়ে গেলেই তোমার মেয়ের সঙ্গে যে লোক অবৈধ সঙ্গ পাতিয়েছিল আর তুমি যার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে খোদাতাল্লার কাছে প্রার্থনা করেছিলে তাকে তুমি আবার মানুষরূপে দেখতে পাবে। তখন তুমি তার ওপর বদলা নিতে পারবে। পুনরায় তোমার সঙ্গে কোনো মহাপুরুষের দেখা হবে এবং তিনি তোমাদের দুজনকেই উদ্ধার করবেন।'

প্রশ্ন—'কুম্ভীপাক নরকে তুমি কী দেখলে ?'

উত্তর—'কুম্ভীপাক নরক কমপক্ষে এক হাজার যোজন লম্বা আর এক হাজার যোজন চওড়া, আর তার মুখটা কেবল নয় ইঞ্চি চওড়া। এই নয় ইঞ্চি সরু পথ দিয়ে পাপী-জীবদের তার ভিতরে ফেলে দেওয়া হয়, আর ওই পাপী-জীবেদের যতদিন না শাস্তি শেষ হচ্ছে, ততদিন ওই নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।'

প্রশ্ন—'কুম্ভীপাক নরকে কী কী কষ্ট ?'

উত্তর—'ওই কুম্ভীপাক নরকের ভিতরে দুর্গন্ধ, মল, মূত্র, পুঁজ, রক্ত, গয়ের, থুতু, আগুন এবং আরও অনেক রকমের কষ্টদায়ক পদার্থ আছে,

যা দিয়ে ওই পাপী-জীবদের ভীষণ রকম কষ্ট দেওয়া হয়। কখনো ওদের ধরে নরকের আগুনে ছেঁকা দেওয়া হয়, কখনো দুর্গন্ধের ভিতরে অর্থাৎ মল ভর্তি কুয়োতে ডুবিয়ে রাখা হয়। যে সব লোক পরস্ত্রীগামী তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে উত্তপ্ত লোহার স্ত্রীমূর্তিতে আলিঙ্গন করানো হয়। ভিন্ন ভিন্ন পাপীদের ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভয়ংকর ভয়ংকর যন্ত্রণার ব্যবস্থা আছে। সময় শেষ হলে ফের কুম্ভীপাক নরক থেকে তুলে এনে অন্য কোনো যোনিতে নিক্ষেপ করা হয়।'

প্রশ্ন—'কুম্ভীপাক নরক থেকে বের করার পর তোমায় কী করা হল ?'

উত্তর—'আমি কুম্ভীপাক নরকের ভয়ংকর যন্ত্রণা ভোগ করার পর এই প্রেতজন্ম পেলাম। প্রেতযোনি পাবার পর আমি আমার নিজের গ্রাম মুঘল-খেড়ায়, যেখানে আমার কবর ছিল সেখানে গিয়ে বাস করতে লাগলাম। আমার মাজারে পুজো দিতে যে সব লোক আসত আমি তাদের সবাইকে দেখতে পেতাম কিন্তু তারা কেউ আমাকে দেখতে পেত না। আমার সঙ্গে ওখানে পাঁচজন পীর থাকত। ওদের মধ্যে একজন প্রেতের বয়স পৌনে তিন হাজার বছর, দ্বিতীয়জনের বয়স তিন হাজার বছর, তৃতীয়জনের বয়স সাড়ে তিন হাজার বছর, চতুর্থজনের বয়স পাঁচ হাজার বছর আর পঞ্চমজনের চার যুগ। তাদের কলিযুগের বহু আগে প্রেতযোনি প্রাপ্তি হয়েছে।'

প্রশ্ন—'যার বয়স চার যুগ তার উদ্ধার কী করে হবে ?'

উত্তর—'কোনো মহাপুরুষ তাকে উদ্ধার করবেন, না হলে কলিযুগের শেষে যখন ভগবান স্বয়ং কল্কি অবতার হবেন তখন তিনি তাকে উদ্ধার করবেন।'

প্রশ্ন—'তুমি এই মনমোহন সিংহের শরীরে কীভাবে প্রবেশ করলে ?'

উত্তর—'প্রেতযোনিতে এক হাজার বছর সম্পূর্ণ হবার কিছু বাকি ছিল। সেই সময় এই ছেলেটি, যে পূর্বজন্মে সেই সাধুতপস্বী ছিল, আর যে আমার মেয়ের সঙ্গে অবৈধ সঙ্গ করেছিল, একদিন হঠাৎ এসে আমার মাজারের ওপরে প্রস্রাব করে দিল। আমি একে খুব ভালোভাবে লক্ষ্য

করলাম আর এর আত্মাকে আমি চিনে ফেললাম যে, এই তো সেই সাধু যে আমার মেয়েকে অন্যায়ভাবে নষ্ট করেছিল। আর আমি তখনই ঠিক করলাম যে আর কোনো কথা নেই, এর বদলা নেব। আমি তৎক্ষণাৎ একে ধরে ফেললাম আর এর শরীরে ঢুকে বসলাম। আমি আরও অনেককে ধরে ধরে মেরে ফেলেছি কিন্তু একে এই জন্যেই মারলাম না যে এর দ্বারা আমার উদ্ধার হবে। আজ সাত বছর আমি এই মনমোহনের শরীরের ভিতর রয়েছি আর এখন সেই সময় এসে গেছে যা ধর্মরাজ স্বয়ং আমার এবং এর মুক্তির জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তাঁর সব কথাই মিলে যাচ্ছে। তাই আমি একে খুব কষ্ট দিয়ে আমার বদলাও নিয়ে নিয়েছি আর এখন আমরা মহাপুরুষের আশ্রয়ও পেয়েছি। আমাদের উভয়েরই মুক্তির সময় এখন উপস্থিত।'

প্রশ্ন—'কার ভজনা করলে মানুষের কল্যাণ হবে ?'

উত্তর—'নিজ নিজ গুরুপ্রদত্ত ভগবানের নাম জপ করলে মানুষের কল্যাণ হবে।'

প্রশ্ন—'ধর্মরাজকে দেখতে কেমন ?'

উত্তর—'ধর্মরাজ দেখতে খুব সুন্দর। তার সাদা ধবধবে লম্বা দাড়ি আর মাথা ভর্তি সাদা চুল। আর তিনি খুব রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন। তাঁর শরীর সূক্ষ্ম এবং দিব্য আর তিনি সেই শরীর পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন।'

প্রশ্ন—'প্রেতদের খাবার কী আর তারা কী কী খেতে পায় ?'

উত্তর—'প্রেতরা মরার হাড় চুষে খায়, রক্ত খায় আর যত দুর্গন্ধ পচা জিনিস আছে সেই সব খায়। পোড়া কাঠের কয়লাও খায়। এই তাদের নিত্য খাদ্য।'

প্রশ্ন—'তোমরা প্রেতেরা কোথায় থাক ?'

উত্তর—'আমরা ভাঙা দালানে কিংবা গাছের উপরে বাস করি। খুব চিৎকার করি, কাঁদি, জোরে জোরে ডাকি কিন্তু আমাদের শব্দ কেউ শুনতে পায় না। আমাদের খুবই ক্ষিদে এবং জলপিপাসা পায় কিন্তু খাদ্য ও জলের অভাবে খুবই দুঃখকষ্ট ভোগ করি।'

প্রশ্ন—'তোমার প্রেতযোনি কেন হল ?'

উত্তর—'আমার পূর্বজন্মের ভয়ানক পাপকর্মের ফলে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছিলাম। আমি আংটি কবচ তৈরি করে বিক্রি করতাম আর ঝাড়ফুঁক করতাম, ভূত-প্রেত তাড়াবার মিথ্যা বুজরুকি দেখিয়ে, সত্যি-মিথ্যা বলে লোককে ঠকিয়ে পয়সা নিতাম। এই রকম নানা দুষ্কর্মের জন্য আমাকে প্রেতযোনি পেতে হয়েছে। আমার জীবিত অবস্থায় সমস্ত কর্মই খুব নোংরা ছিল আর আমি অপরের স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সংসর্গও করতাম। আমি আরও অনেক মহা মহা দুষ্কর্ম আর মহা মহা পাপকাজ করেছিলাম যার জন্যে আমাকে কুম্ভীপাক নরকে যেতে হয়েছিল আর তাই আমি নিজের এই কর্মফল ভোগ করছি। তারপরই আমার এই একহাজার বছরের প্রেতযোনি প্রাপ্তি—যার কষ্ট এখনও ভোগ করছি।'

প্রশ্ন—'তোমরা ভূত-প্রেতরা কীর্তন গান সৎসঙ্গ ইত্যাদিতে কী শান্তি পাও ?'

উত্তর—'প্রেত আর অন্য ভূতদের সৎসঙ্গে কিংবা নাম-কীর্তনের আসরে যাওয়ার হুকুম নেই। যদি কোনো ভূত-প্রেত এই রকম কীর্তন গান বা সৎসঙ্গের আসরে যায় তবে তাদের দেহে জ্বালার সৃষ্টি হবে, খুবই অস্বস্তি বোধ করবে। যেখানে কীর্তন গান বা কোনো সৎসঙ্গ হয় সেখান থেকে ভূত-প্রেত একদম পালিয়ে যায়। যদি কোনো প্রেত কোনো মানুষের শরীরে প্রবেশ করে আর সেই লোক কোনো মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসে আর সেই মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টি তার ওপর পড়ে এবং তিনি যদি আদেশ দেন যে, 'তুমি সৎসঙ্গ করো, কীর্তন গান শোনো, এতে তোমার শান্তি হবে—তাহলে সৎসঙ্গ কথা-কীর্তন করলে সে অবশ্যই শান্তি লাভ করবে।'

এখানে প্রেতকে মাস্টার রাজেন্দ্র সিংহের করা সমস্ত প্রশ্নোত্তর দেওয়া হল। এ কথা মনে থাকে যে, ছাত্র মনমোহন সিংহ কোরানের একটা অক্ষর পর্যন্ত পড়তে না জানলেও ওই মুসলমান সুলেমান তার শরীরে ঢুকে থাকার জন্যে সে কোরানের আয়াত পর্যন্ত গড়গড় করে বলে যেত।

———∘———

শ্রাদ্ধ-তর্পণ, ব্রাহ্মণভোজনে পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি

(পরম পূজ্যপাদ শ্রীমজ্জগদ্‌গুরু শংকরাচার্য গোবর্ধন পীঠাধীশ্বর স্বামী শ্রী নির্জনদেবতীর্থ মহারাজের কথিত সর্বৈব সত্য ঘটনা)।

গত বিক্রম সংবৎসর ২০২৫ সালের কার্তিকী পূর্ণিমার কথা, ভারতের মহান তীর্থ শ্রীগড়মুক্তেশ্বরের মেলায় এক বিরাট সনাতন ধর্ম সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ ধর্মাচার্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীমজ্জগদ্‌গুরু শংকরাচার্য গোবর্ধন মঠাধীশ্বর স্বামী নির্জনদেবতীর্থ মহারাজও উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ শ্রীআচার্যচরণ নিজ মুখে এক পরলোকগত আত্মা কীভাবে তার কন্যাকে দিয়ে শ্রাদ্ধ-তর্পণ, ব্রাহ্মণভোজন, দানাদি প্রার্থনা করেছিল আর তন্নিমিত্ত সব কিছু করানোর পর তার কী পরিমাণ সুখ হয়েছিল সে সম্বন্ধে এক অতি আশ্চর্যজনক ঘটনার কথা শুনিয়ে আমাদের লিখে নিতে বলেছিলেন। সেই ঘটনার কথাই নীচে তুলে ধরছি—

আজ থেকে বেশ কিছুদিন আগের কথা। আমি বিহারের গিচ্ছি (গিরিডিহ্) গিয়েছিলাম। সেখানে এক তামিল-পরিবার থাকত। ওই তামিল ভদ্রলোক সরকারি চাকরি করতেন। একদিন তার স্ত্রী এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। ভালো হিন্দি বলতে পারত না, এজন্যে নিজের বক্তব্য ইংরেজিতে লিখে জানাচ্ছিল—

'মহারাজ ! আমরা তামিলভাষী। আমাদের নিয়মমতে কন্যাই মায়ের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়। ফলে মায়ের মৃত্যুর পর আমিও নিয়মমতো মায়ের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েছিলাম। যতদিন

আমার বিয়ে হয়নি ততদিন আমি বেশ সুখে-শান্তিতে এবং আনন্দে ছিলাম, আমার কোনোরকম দুঃখ কষ্ট ছিল না। পরে যখন আমার বিয়ে হল আর আমি শ্বশুরবাড়ি চলে গেলাম, তারপর থেকেই আমার মনে সর্বদা দুঃখ, অশান্তি আর কষ্ট দানা বাঁধতে লাগল। রাত্রে ঘুম হত না। শ্বশুর-বাড়িতে সবরকম সুখস্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা ছিল, কোনো কিছুর অভাব ছিল না। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি ও বাড়ির সবাই আমাকে খুব ভালবাসত এবং আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করত তবুও আমার মন সর্বদাই দুঃখে ভরে থাকত। এর কারণ আমি কিছুই বুঝতে পারতাম না।

'একদিন আমি অন্যদিনের মতো রাত্রে নিজের খাটে শুয়ে আছি আর সে সময় কিছুটা তন্দ্রার ভাব এসেছে, হঠাৎ দেখি আমার পূজনীয়া মা সশরীরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। সেই সময় মাকে খুব চঞ্চল আর খুব দুঃখী বলে মনে হচ্ছিল। তাকে আমি এ অবস্থায় দেখে একদম বিচলিত হয়ে পড়লাম। আমার মাকে এরকম দুঃখী দেখে আমার খুব কষ্ট হল। সেই দুঃখে আমার সারা রাত্রি চোখে ঘুম এল না। কিছুদিন আমার খুবই অস্বস্তিতে কাটল। একদিন আমি আমার স্বামীকে মায়ের এই দুর্দশার কথা এবং দেখা দেওয়ার কথা শোনালাম। তিনি আমার কথা শুনে খুব অবাক এবং দুঃখিত হলেন।

'অতঃপর একদিন রাত্রে আমি আর আমার স্বামী এক সঙ্গে এক-জায়গায় বসে মনে মনে মাকে ধ্যান করলাম আর এই প্রার্থনা করলাম যে—'মা ! তোমাকে দুঃখজনক অবস্থায় দেখে আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। তোমার কীসের দুঃখ আর আমাদেরই বা কেন কষ্ট দিচ্ছ ? দয়া করে এর কারণ বলো। আমাদের যদি কিছু ভুল বা অপরাধ হয়ে থাকে তাও বলো। তুমি যা বলবে আমরা অবশ্যই তা পালন করব। আর তোমার দুঃখকষ্ট দূর করার যথাশক্তি চেষ্টা করব।'

এই প্রার্থনা জানিয়ে আমরা বিছানায় শুলাম আর ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু শত চেষ্টা করেও সেদিন আমাদের ঘুম এল না। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মা আমাকে আবার দেখা দিলেন, আর স্পষ্ট ভাষায় খুব রাগের সঙ্গে আমাকে বললেন—'আমি আমার সমস্ত ধনসম্পত্তির মালিকানা তোকে দিয়েছি কিন্তু আজ আমি এখানে এত কষ্ট ভোগ করছি। তোরা আমার সম্পত্তি আরামে ভোগ করে যাচ্ছিস কিন্তু আমাকে তোরা কিছুই দিচ্ছিস না। আমার কাপড়চোপড় কিছু নেই। আমি ক্ষিদেয়, পিপাসায় কাতর হয়ে ঘুরে মরছি। কাপড়ের অভাবে ঠাণ্ডায় খুব কষ্ট ভোগ করছি। বর্তমানে আমি অতি দীনদুঃখীর মতো মহা অশান্তিতে রয়েছি। যদি তোরা আমার জন্যে এই সময় কিছু না করিস আর আমাকে কিছু না দিস তবে মনে রাখিস তোদের সব সম্পত্তি আমি কেড়ে নেব আর তোদের কোনোদিন শান্তিতে থাকতে দেব না। বরাবর অশান্তিতে রেখে দেব।'

মায়ের মুখে একথা শুনে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলাম আর সঙ্গে সঙ্গে খুব দুঃখও পেলাম। আমার ভুলের জন্যে খুব অনুতাপ হতে লাগল। মাকে আমি খুব মিনতি করে বললাম—'মা ! এখানে তো আমাদের ওখানকার মতো ভালো ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না আর আমাদের দেশের প্রথামতো, সেখানকার বিধি-নিয়মে এখানে শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদিও করা হয় না। আমার চরম অপরাধের এটিই হল কারণ। তুমি আমাকে এই অপরাধের জন্যে ক্ষমা করে দাও। আর আমাদের দেশের বিধি-বিধান অনুযায়ী শ্রাদ্ধ-শান্তি না করায় আমি কী করব, তা কেমন করে করব তাও বলো ! এ অবস্থায় আমার কী করণীয়, এ সব আমাকে দয়া করে বলো।'

মা আমার কথা শুনে বললেন—'দেশ-কাল অনুযায়ী এখানে তুমি যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে পাবে আর তোমার মন যাকে উপযুক্ত মনে করবে তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে ডেকে তিনি যেমন বিধান দেবেন সেই বিধান অনুসারে

আমাকে উপলক্ষ করে আমার জন্যে অন্নবস্ত্রাদি দাও। তোমার এইভাবে দেওয়া দান আমি নিশ্চয় পাব আর তাতেই আমার তৃপ্তি এবং তুষ্টি হবে।

পূজনীয়া মায়ের আদেশ অনুযায়ী আমি পরের দিনই এখানকার কয়েকজন বিদ্বান, সদাচারী ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে তাদের দিয়ে ভক্তি-সহকারে মায়ের নামে শ্রাদ্ধ-তর্পণ আদি করালাম, ব্রাহ্মণভোজন করালাম। তাদের দান-দক্ষিণাও দিলাম, যথাশক্তি অন্নবস্ত্রাদিও দিলাম এবং তাদের পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট করে তাদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বিদায় করলাম।'

মায়ের কথা অনুযায়ী আমি তো শ্রাদ্ধ-তর্পণ ব্রাহ্মণভোজন, দান-দক্ষিণা আদি সব রকম কাজ করলাম কিন্তু তবু আমার মনে এই আশঙ্কা থেকে গেল যে আমার দেওয়া শ্রাদ্ধে দান আদি আমার মা পেলেন কি না আমার এরূপ শ্রাদ্ধ-কর্মে তিনি সন্তুষ্ট হলেন কি না ?

আমার মনের এই রকম অন্তর্দ্বন্দ্ব আর আশঙ্কা দেখে দু-তিন দিন বাদে মা আবার আমাকে স্বপ্নে দেখা দিলেন আর ডান হাত তুলে বললেন— 'বেটি ! তোর এই শ্রাদ্ধ-তর্পণে এবং আমার উপলক্ষে করানো ব্রাহ্মণ-ভোজনে ও ব্রাহ্মণকে অন্নবস্ত্র দানে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন আর আমার কোনো কষ্ট নেই। তোর দেওয়া সব কিছু আমি পেয়েছি। তুই আমাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিয়েছিস। তোর দেওয়া খাবারে আমি পরিপূর্ণ তৃপ্তি আর সন্তুষ্টি লাভ করেছি। তুই তো কাপড়চোপড়ও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক দিয়েছিস। আমার আর কোনো জিনিসের অভাব নেই। আমি খুশি হয়ে তোদের আশীর্বাদ করছি। তোদের আমার আর একটা কথা বলার আছে, প্রত্যেক বছর আমার নামে শ্রাদ্ধের দিনে অন্তত একবার শ্রাদ্ধ করাস। ব্যস্ ! এতেই আমি সুখে-শান্তিতে থাকব আর তোদের উপর সন্তুষ্ট থাকব।'

মায়ের মুখ থেকে 'তোর দেওয়া সব কিছু আমি পেয়েছি' শুনে আমার

সব আশঙ্কা আর দুঃখ দূর হয়ে গেল। এখন আমি মায়ের আদেশ অনুসারে প্রতি বছর ব্রাহ্মণদের ডেকে তার নামে শ্রাদ্ধ-তর্পণ করাই, ব্রাহ্মণদের ভোজন করাই আর যথাশক্তি তাদের দান-দক্ষিণাদি দিয়ে সন্তুষ্ট করি। আমার এই নিয়ম আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

পাঠকবৃন্দ ! পূজ্যপাদ শ্রীমজ্জগদ্গুরু শংকরাচার্য মহারাজের শ্রীমুখ থেকে আর পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীআচার্যচরণের কাছে বর্ণিত একজন ইংরাজি জানা তামিল মহিলার বিবরণ অনুযায়ী এই সত্য ঘটনা আপনাদের সামনে রাখলাম।

এখনও কি আমাদের শাস্ত্র-পুরাণে বর্ণিত শ্রাদ্ধ-তর্পণ, ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিবিধান করার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ আছে ? আমাদের সনাতন ধর্মের ধর্মশাস্ত্রের সব কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্যি—এ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

——— ০ ———

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের মাহাত্ম্য

(এক পরলোকগত আত্মা নিজের উদ্ধারের জন্যে বাড়ির লোকদের দিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ পালনের প্রার্থনা জানায় আর সপ্তাহ করার পর তার সদ্‌গতি লাভ হয়।)

[পরম পূজ্যপাদ শ্রীমজ্জগদ্‌গুরু শংকরাচার্য গোবর্ধন মঠাধীশ্বর শ্রীস্বামী শ্রীনির্জনদেব মহারাজের শ্রীমুখে শোনা এক সত্য ঘটনা।]

গত ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ বারাণসী ধামে পুরী মঠাধীশ্বর শ্রীমজ্জগদ্‌গুরু শংকরাচার্য গোবর্ধন মঠাধীশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত স্বামী নির্জনদেব মহারাজ এসেছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহব্যাপী পারায়ণ-মাহাত্ম্যের এক অদ্ভুত আশ্চর্যজনক সত্য ঘটনার কথা শুনিয়েছিলেন যা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে—

উড়িষ্যার বিখ্যাত কটক শহরে গোলাপ রায় মাণ্ডুমল নামে একটি বড় কোম্পানি ছিল। ভারত মাতা গুড়াক্ ফ্যাক্টরি তার অধীনস্থ একটি ব্যবসায়িক সংস্থা। প্রায় তিন বছর আগে সেই কোম্পানির মালিকের বিবাহিতা যুবতী কন্যা মারা গিয়েছিল আর সে মৃত্যুর পর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছিল। তার এক জেঠতুতো বোন ছিল, যে তার থেকে বয়সে বড়। প্রেতযোনিপ্রাপ্ত ওই আত্মা তার জেঠতুতো দিদিকে খুব বিরক্ত করত। তার বন্ধুবান্ধব আর আধুনিক লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমান লোকেরা এবং ইংরাজি জানা লোকেরা একে হিস্টিরিয়ার রোগ মনে করে ডাক্তারি চিকিৎসা করাবার পরামর্শ দেয়। ঘরের লোকেরা সকলের পরামর্শ অনুযায়ী ভাল ভাল বিখ্যাত বিখ্যাত ডাক্তারদের দিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। চিকিৎসায় অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যায় কিন্তু কোনো উপকার হয় না। রোগ কমার পরিবর্তে আরও বেড়ে যেতে লাগল। যখন শহরের বড় বড় ডাক্তার দিয়ে কোনো লাভ হল না তখন স্থানীয় ডাক্তার এবং অন্যান্যদের পরামর্শ

অনুযায়ী তাকে চিকিৎসার জন্য কলকাতা, মুম্বাই প্রভৃতি বড় বড় শহরে নিয়ে গিয়ে সেখানকার নাম-করা ডাক্তারদের দিয়ে চিকিৎসা করাবার ব্যবস্থা করল। এইসব চিকিৎসায় অঢেল টাকা খরচ হয়ে গেল। কিন্তু একশো ভাগের এক ভাগও রোগ ভালো হল না। উপরন্তু রোগ বেড়েই চলল। শুধু ওর ঘরের লোকজনই নয়, দূরদুরান্তের আত্মীয়স্বজন আর আশপাশের লোকজনও বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ল যে, এ কী রোগ তাকে ধরল যে ভালো ভালো ডাক্তাররাও তা ধরতে পারছে না। অন্তত যখন রোগীর আত্মীয়রা চিকিৎসা করাতে করাতে হয়রান আর চারিদিক থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছে তখন একদিন ওই জেঠতুতো দিদির শরীরে ভর করে পরলোকগত ছোট বোনের আত্মা বলল—'এর কোনো রোগ নেই। এ আমার জন্য কষ্ট পাচ্ছে আর আমি নিজেও প্রেতযোনিতে এখন খুব কষ্ট পাচ্ছি। যতদিন না আমার এই পিশাচযোনি থেকে মুক্তি হচ্ছে ততদিন আমার এই বড় দিদি লাখো চিকিৎসা করালেও রোগমুক্ত হবে না আর এর সুখ-শান্তিও হবে না।' বাড়ির লোকেরা জিজ্ঞাসা করল 'তোমার এই পিশাচযোনি থেকে মুক্তি আর তোমার শান্তির জন্যে কী করতে হবে আমাদের বলো, আমরা সব উপায় সেই মতো করব।' উত্তরে পিশাচযোনিপ্রাপ্ত ওই পরলোকগত আত্মা বলল—'আমার মুক্তির আর সদ্‌গতির একমাত্র উপায় হল শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ শ্রবণ। শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ শ্রবণের অতিরিক্ত লাখো টাকা খরচ করলেও ওর রোগ সারবে না এবং আমার এই প্রেতযোনি থেকেও মুক্তি হবে না। সেজন্যে বলছি, তোমরা যদি চাও যে আমার দিদি রোগ মুক্ত হোক আর আমারও পিশাচযোনি থেকে মুক্তি হয়ে আমার সদ্‌গতি হোক তবে তোমরা অতি সত্বর এক সদাচারী বিদ্বান ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে তাকে দিয়ে সপ্তাহ পারায়ণের আয়োজন করো।'

তখন তার মা-বাবা আর ভাইরা সেই বছর (সংবৎ ২০২৬ ভাদ্র মাসে) সনাতনধর্মী, বিদ্বান এক ব্রাহ্মণকে ডেকে শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ শ্রবণ আরম্ভ করে দিল।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথা তো আরম্ভ হয়ে গেল কিন্তু বাড়ির লোকেরা এবং

ভাগবত-পাঠক ওখানে বাঁশ পুঁততে ভুলে গেল, যা ভাগবত সপ্তাহ কথা পাঠের প্রারম্ভে পালনীয় একটি অতি প্রাচীন এবং অতি অবশ্যকরণীয় শাস্ত্রীয় প্রথা। বলা হয় যে পরলোকগত আত্মা তার উপরে বসে ভাগবতের কথা শোনে। ওই পরলোকগত আত্মার সংশয় দেখা দিলে, সে আবার তার জেঠতুতো দিদির শরীরে ভর করে বলতে লাগল—'তোমরা শ্রীমদ্ভাগবতের কথা আরম্ভ করেছ কিন্তু প্রথা অনুযায়ী বাঁশ পোঁতোনি, যাতে বসে আমি কথা শুনব। সবাই জানে যে, ভাগবত সপ্তাহ পাঠের সময় প্রাচীনকালে বাঁশের উপরে বসে ধুন্দুকারী নামক প্রেত তার নিজের ভাই গোকর্ণের (যে গোরুর পেটে জন্মেছিল) কাছে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ পাঠ শুনে মুক্তি লাভ করেছিল। তোমরাই বলো, আমি কোথায় বসে শ্রীমদ্ভাগবতের পরম পবিত্র কথা শুনে মুক্তি লাভ করব ?'

পরলোকগত আত্মার এই কথা শুনে সকলে ভুল স্বীকার করল, আর সেখানে একটা গাঁটওয়ালা বাঁশ পুঁতে দিল। কিন্তু বাঁশ পোঁতার পরও আরেকটা ভুল হয়ে গেল যে, বাঁশের ওপরে যে একটা কাপড় জড়িয়ে দিতে হয় তা জড়ানো হয়নি।

পরলোকগত আত্মা আবার তার জেঠতুতো দিদির শরীরে ঢুকে বললে—' তোমরা ওই বাঁশের ওপরে কাপড় জড়াওনি। আচ্ছা বল, এই ন্যাড়া বাঁশের ওপর কোনখানে আমি বসব ? খালি বাঁশের উপরে বসলে কষ্ট হবে, তাই তাড়াতাড়ি বাঁশের মাথায় একটা কাপড় জড়িয়ে দাও যাতে আমি আরামে বসে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ শুনতে পারি। তখন সবাই তাড়াতাড়ি একটা কাপড় নিয়ে খালি বাঁশটাকে জড়িয়ে দিল। আর নিজেদের ভুল স্বীকার করে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল। এই খবর আশে-পাশে এবং পণ্ডিত মহলে সব জায়গায় প্রচার হয়ে গেল। তখন শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ শোনার জন্যে হাজার হাজার লোক ভিড় করতে লাগল এবং এই অতি আশ্চর্যজনক ঘটনা থেকে পুনর্জন্ম, বেদ, পুরাণ প্রভৃতিতে উল্লিখিত উপায়ে লোকেদের আস্থা বৃদ্ধি পেল।'

অবশেষে ওই আত্মা তার ভাইদের আর নিজের মাকে বলল—'আমার

বাবারও মুক্তি হয়নি কারণ আজকালকার লোকেরা মা-বাবার সম্পত্তি তো ভোগ করে কিন্তু তাদের জন্যে শ্রাদ্ধ-তর্পণ, ব্রাহ্মণভোজন দান পুণ্য ইত্যাদি শাস্ত্রীয় কর্মবিধি শ্রদ্ধা-বিশ্বাসপূর্বক করে না। এইজন্য তাদের বাবা-মায়ের অধোগতি হয়। অতএব বাবার মুক্তির জন্যেও শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ পাঠ অবশ্য করাবে, তবে তার মুক্তি হবে।'

এসব ঘটনার কথা শুনে কলকাতা থেকে ওই পরলোকগতা আত্মার শাশুড়ি সপ্তাহ পারায়ণ শোনার জন্যে সেখানে এসে গেল। ওই পরলোকগতা আত্মা ফের তার দিদির শরীরে ঢুকে তার শাশুড়িকে বলল—'এই ভাগবত সপ্তাহ পাঠের যত খরচ হবে সব আপনি আমার শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে মেটাবেন। কেন না মৃত্যুর পর বিবাহিতা স্ত্রীর ক্রিয়াকর্মের সকল খরচ শ্বশুরঘরের লোকেদেরই করতে হয়, তার মা-বাবা বা ভাইদের নয়। অতএব আপনি যদি এই ভাগবত সপ্তাহের খরচ বহন না করেন তবে আমার মা-ভাইদের দেওয়া খরচে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ পাঠে আমার মুক্তি হবে না। শাশুড়ি এ কথা শুনে আনন্দের সঙ্গে ব্যয়ভার স্বীকার করে নিলেন। সানন্দে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ শেষ হওয়ামাত্র ওই আত্মা সদ্‌গতিপ্রাপ্ত হল, আর এদিকে জীবিত জেঠতুতো দিদিও সমস্ত রকম রোগ-শোক থেকে মুক্তি পেল। আজ সে সম্পূর্ণ সুস্থ আর তার আত্মীয়-স্বজনও সুখে বাস করছে।'

এই হল শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের অদ্ভুত মাহাত্ম্য যা শোনামাত্রই পরলোকগত আত্মা পিশাচযোনি থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি পেল, আর তার সদ্‌গতি হল। যারা এই পরম কল্যাণকর পুরাণের নিন্দা করে তারা নিজের, নিজ সন্তানসন্ততিদের, জাতির এবং সমগ্র দেশের যে কত ক্ষতি সাধন করে তা বলা যায় না।

এই সত্য ঘটনা থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে আমাদের শাস্ত্র-পুরাণের সব কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

আশাকরি পাঠকবৃন্দ সত্য সনাতন ধর্মের প্রাণস্বরূপ এই পুরাণের অদ্ভুত মাহাত্ম্য বুঝবেন এবং পুরাণের কথা অনুসারে আচরণ ও সনাতন ধর্মের আশ্রয়ে থেকে নিজের তথা দেশ এবং জাতির পরম কল্যাণ সাধন করবেন।

পূর্বজন্মে লক্ষ্ণৌয়ের এক ধনী মুসলমানের কাহিনী

আয়কর বিভাগের এক অফিসারের ছেলের কথা

(পূর্বজন্ম প্রমাণকারী একটি সত্য ঘটনা)

আমার জ্যাঠামশায়ের ছেলে লালা ত্রিলোকচন্দ্র হলেন আমার বড় দাদা। তাঁর এক ছেলে মহেন্দ্রপাল গোয়েল বি.এ, এল.এল.বি উকিল (আমার ভাইপো)। সে গাজিয়াবাদে ওকালতি করে। ১৯৭০ সালের জুলাই মাসের কথা, মহেন্দ্রপাল আমার এখানে এসেছিল। তার মুখ থেকে শোনা, গাজিয়াবাদে শ্রীব্রজবিহারীলাল সিংহল নামে এক আয়কর অফিসারের ছেলে তার পূর্বজন্মের সব কথা হুবহু বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সে নিজেকে লক্ষ্ণৌয়ের এক মুসলমান বলে পরিচয় দিচ্ছে। আমার শুনে খুব আশ্চর্য লাগল যে মুসলমানরা সাধারণত পূর্বজন্ম স্বীকার করে না, সেই মুসলমানদের একজন পুনরায় জন্ম নিয়েছে, এর চেয়ে বড় পূর্বজন্মের সত্যতার প্রমাণ আর কী হতে পারে ? সেই ছেলেটিকে দেখবার জন্যে এবং তার সঙ্গে দেখা করে সব কথা জানার জন্যে আমার খুব আগ্রহ হল। আমার ভাইপো মহেন্দ্রপালকে বললাম— 'আমাকে সেই ছেলেটির সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দাও।' সে বললে— 'কাকাবাবু, আমি গাজিয়াবাদ গিয়ে ওই অফিসারের মতামত নিয়ে আপনাকে তার সঙ্গে দেখা করাবার ব্যবস্থা করব।'

আমার ভাইপো গাজিয়াবাদ গিয়ে শ্রীব্রজবিহারীলাল সিংহলের সঙ্গে দেখা করে। তিনি আনন্দের সঙ্গে রাজি হন। তখন মহেন্দ্রপাল আমাকে খবর দেয় যে—'উনি মত করেছেন, কিন্তু তাঁর আর একজায়গায় বদলির অর্ডার হয়েছে, তাই আপনি দু-চার দিনের ভিতরেই গাজিয়াবাদ চলে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন, নইলে তিনি বাইরে চলে যাবেন।'

আমি ১৯৭০ সালে ১১ জুলাই গাজিয়াবাদ গিয়ে পৌঁছলাম আর আমার ভাইপো মহেন্দ্রপালকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাংলোয় গেলাম। দেখলাম তাঁর বাইরে যাবার পুরো গোছগাছ হয়ে গেছে আর সমস্ত জিনিসপত্র ট্রাকে তোলা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা আমাকে ওই অবস্থাতেও পুরো সময় দিলেন। আনন্দের সঙ্গে সকলে একত্রিত হলাম। ছেলেটির বাবা আয়কর অফিসার বাবু শ্রী ব্রজবিহারীলাল, ছেলেটির মা, ভাই এবং ওই পূর্বজন্মের কথা বলা ছেলেটি (সুভাষচন্দ্র)—সকলে পাশাপাশি বসলাম। কমপক্ষে দুই ঘন্টা ধরে তাদের সঙ্গে আমার খোলাখুলি কথাবার্তা হল। আমি সব কথাই লিখে নিয়ে এসেছিলাম যা আজ পাঠকবর্গের কাছে নিবেদন করছি। দয়া করে মন দিয়ে পড়বেন।

ছেলেটির পূর্বজন্মের কথা কী করে মনে পড়ল ?

আমি ছেলেটির বাবা শ্রীব্রজবিহারীলালকে প্রশ্ন করেছিলাম—

'আপনার এই ছেলে সুভাষচন্দ্রের পূর্বজন্মের কথা আপনি প্রথমে কীভাবে জানতে পারলেন ? আর সে প্রথমে কী কথা বলেছিল ?'

সিংহলজী—'আমরা জাতিতে আগরওয়াল বৈশ্য, মীরাটের বাসিন্দা। মীরাটের বিখ্যাত উকিল স্বর্গীয় বাবু বৈজুনাথ হলেন আমার বাবা। যখন এই ছেলে জন্মাল তখন এর ভাল নাম রাখা হল সুভাষচন্দ্র, পরে সবাই তাকে 'বালে' বলে ডাকত। যখন আমি আয়কর অফিসার হয়ে বেরিলিতে গেলাম তখন এই ছেলেও সঙ্গে ছিল। একবার আমার বড়ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে এক উৎসবের আয়োজন করেছিলাম। জন্মদিন উপলক্ষে বাড়িতে খাওয়াদাওয়া হল, আর বড়ছেলেকে উপহার দেওয়ার জন্য বাজার থেকে একটি ক্যারামবোর্ড কিনে আনলাম। আমার বড়ছেলে আর সুভাষ দুজনে ক্যারামবোর্ড খেলছিল। খেলতে খেলতে হঠাৎ কোনো বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে একটু ঝগড়া হয়। দৈবক্রমে ঠিক ওই সময়ে সুভাষের পূর্বজন্মের স্মৃতি জেগে ওঠে আর সে রেগে গিয়ে ক্যারামবোর্ডটা একদিকে ছুঁড়ে দিয়ে দাদাকে বলে—'এই নে তোর ক্যারামবোর্ড, আমাকে খুব গরিব মনে করেছিস, তাই না ? আমি লক্ষ্ণৌয়ের এক বিরাট ধনী লোক ছিলাম।

লক্ষ্ণৌয়ে আমাদের বাড়িতে নব্বই হাজার টাকা মাটিতে পোঁতা আছে, একটা নয় ওই টাকায় আমি এরকমের হাজারটা ক্যারামবোর্ড কিনতে পারি।'

ব্যস্ ওই দিন থেকে ও তার পূর্বজন্মের কথা সব বলতে আরম্ভ করল।

প্রশ্ন—'বালক সুভাষচন্দ্র আপনাকে নিজের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে কী পরিচয় দিয়েছিল ?'

সুভাষকে যখন আমি জিজ্ঞাসা করি—'তুই পূর্বজন্মে কে ছিলি ?'

সে বলেছিল—আমি পূর্বজন্মে জাতিতে মুসলমান ছিলাম। সেই সময় আমার নাম ছিল জানমহম্মদ খাঁ। আমি একজন খুব বিরাট ধনী লোক ছিলাম আর লক্ষ্ণৌয়ে থাকতাম।'

তারপর ছেলেটির সঙ্গে আমার নিম্নরূপ প্রশ্নোত্তর হয়েছিল—

প্রশ্ন—'লক্ষ্ণৌয়ে তুমি কোথায় থাকতে ?'

উত্তর—'লক্ষ্ণৌয়ে এ আমি কেসরবাগে থাকতাম।'

প্রশ্ন—'তুমি ওখানে কী করতে ?'

উত্তর—'আমার শ্বশুর খুব টাকাপয়সাওয়ালা লোক ছিল। তার কোনো ছেলে ছিল না। ওই মেয়েই তার সব ছিল। তাই শ্বশুর আমাকে ঘরজামাই করে রেখেছিল। তার সমস্ত সম্পত্তি তার দোকান-বাড়ি, টাকা-পয়সা সবকিছুর আমাকে মালিক করে দিয়েছিল।'

প্রশ্ন—'তোমার শ্বশুরের কী নাম ছিল ?'

উত্তর—'আমার শ্বশুরের নাম ছিল দিলদার খাঁ।'

প্রশ্ন—'তোমার স্ত্রীর নাম কী ছিল ? তোমার কটি ছেলেমেয়ে ? সেই ছেলেদের নাম কী আর তারা সব কে কী করত ?'

উত্তর—'আমার স্ত্রীর নাম ছিল সোফিয়া খাতুন। সে খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল। আমার চার ছেলে দুই মেয়ে ছিল। দুই ছেলে ওসমানিয়া ইউনিভারসিটি, হায়দরাবাদে লেখাপড়া করত। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ছেলের নাম আব্দুল গফুর খাঁ। আমার দুই মেয়ের এক মেয়ের লক্ষ্ণৌয়ে বিয়ে হয়েছিল আর একজনের এলাহাবাদে।'

প্রশ্ন—'তোমার নব্বই হাজার টাকা কোথায় ছিল ? তার বেশি টাকা তোমার কাছে ছিল কি ? আর সে সময় তোমার কোনো গাড়িঘোড়াও কি ছিল ?'

উত্তর—'তখন আমার অনেক টাকা ছিল। আমি খুব ধনী লোক ছিলাম। নব্বই হাজার টাকা আমি এক জায়গায় খুব গোপন করে মাটিতে পুঁতে রেখেছিলাম। আমার বউ সোফিয়াও ওই টাকার কোনো হদিশ জানতো না। আমি আয়করের ভয়ে নিজের বউ সোফিয়ার নামে স্টেট ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট করেছিলাম। সে সময় আমার একটা খুব সুন্দর মোটরগাড়ি ছিল। বড় সুন্দর একখানা তিনতলা বাড়িও ছিল। আমি দিনে পাঁচবার নামাজ পড়তাম। নামাজে আমার খুব নিষ্ঠা ছিল এবং রোজাও রাখতাম।'

প্রশ্ন—'তোমার গাড়ির নম্বর কত ছিল মনে আছে ?'

উত্তর—'আমার সেই গাড়ির নম্বর ছিল USJ 3289।'

প্রশ্ন—'পূর্বজন্মে তোমার কী করে মৃত্যু হল তোমার কিছু মনে আছে ? বলতে পারবে ?'

উত্তর—গতজন্মে আমি লক্ষ্ণৌয়ে আমার তিনতলা বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়েছিলাম আর সেই সময় হঠাৎ একটা বাঁদর এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমি বাঁদরটার ভয়ে পালাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে যাই আর তাতেই আমার মৃত্যু হয়।'

প্রশ্ন—'লক্ষ্ণৌয়ের বাড়িতে তোমার আর কিছু ছিল, তোমার মনে আছে ?'

উত্তর—'মুসলমানদের সুরমা ব্যবহারের খুব শখ হয়, সেজন্যে আমার কাছে চারটে সোনার সুরমাদানি ছিল, যেগুলো আমি আমার আলমারিতে রাখতাম।'

বালকের পিতার সঙ্গে প্রশ্নোত্তর

আমি ছেলেটির বাবাকে জিজ্ঞাসা করে যে সব উত্তর পেয়েছিলাম তাতে অনেক রহস্য জানা যায়। সে সকল নিম্নরূপ—

প্রশ্ন—'ছেলেটি যে বলল গতজন্মে সে দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ত তো এ জন্মে সেই সময় তার কিছু মুসলমানী সংস্কার আপনার চোখে পড়েছে ?

উত্তর—'একবারের কথা, সেইসময় এ খুব ছোট ছিল। একবার যখন মুসলমানদের 'তৌহার অল বিদা'র নামাজের দিন বা শেষবারের নামাজ, সেদিন ও তার মাকে বলেছিল—'মা আজ তো সবচেয়ে বড় (জুমা) নামাজের দিন তাই আমাদের ঘরে সিমুই তৈরি করো। কখনো কখনো ও নামাজের কাপড় বিছিয়ে নামাজ পড়ার জন্যে ওই রকম বসে যেত, যেরকম অভ্যস্ত কোনো খাঁটি মৌলবি নামাজ পড়তে বসে, যা দেখে আমি খুব অবাক হতাম। তখনকার নানা মুসলমানী চালচলন দেখে লোকেরা ওকে 'বালে' নামের পরিবর্তে 'বালে খাঁ' বলে টিটকারি দিত। কিন্তু কখনো 'মিয়াঁ বালে খাঁ' বললেও রাগ করত না।'

নিজের স্ত্রী সোফিয়া খাতুনকে মনে পড়লে খুব ছটফট করা

প্রশ্ন—'আচ্ছা এ কোনো দিন গতজন্মের স্ত্রী ছেলে-মেয়েদের কী মনে করত ?'

উত্তর—'ব্যস্, আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। ও তার স্ত্রী সোফিয়া খাতুনকে মনে পড়লে খুব ছটফট করত। কখনো কখনো এমন হত যে, আমরা যদি ওকে সঙ্গে নিয়ে কোনো রিক্সায় চেপে কোথাও যেতাম তার সামনে অন্য কোনো রিক্সায় কোনো মুসলিম মহিলা বোরখা পরে এগিয়ে যেত, তাহলে আমরা ঠাট্টা করে বলতাম যে, বালে ! দেখ, তোর গত-জন্মের বিবি ওই রিক্সায় চলে যাচ্ছে। তখন সুভাষ আমাদের কথা শুনে একদম হকচকিয়ে যেত আর সেই মহিলাকে দেখবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠত। আমাদের কথা সত্যি মনে করে আমাদের রিক্সাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তাড়া দিত এবং তাতে বসা মুসলমান মহিলাকে সোফিয়া খাতুন মনে করে খুব খুশি মুখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত। পরে ভাল করে দেখার পর খুব নিরাশ হয়ে বলত—"তোমরা মিথ্যা কথা বলছ, এ আমার বিবি সোফিয়া নয় ; সে তো খুব সুন্দর মেয়ে ছিল, এতো কালো।"

চাকরকে দিয়ে সোফিয়া বিবিকে চিঠি লেখান

সিংহলজী আরও বললেন—'আমাদের বাড়িতে এক চাকর ছিল যে অল্পস্বল্প লেখাপড়া জানত। ও তখন খুব ছোট ছিল। ওই চাকরটা ওকে খাওয়াত। সুভাষ ওই চাকরটাকে বলত তুমি আমার বিবি সোফিয়া খাতুনের নামে লক্ষ্ণৌয়ের ঠিকানায় একটা চিঠি লিখে দাও। চাকরটা তার ঝোঁক দেখে ওকে ভোলাবার জন্যে যা হোক সত্যি-মিথ্যা একটা চিঠি লিখে দিত। সেই চিঠি সুভাষ খামে ভরে চিঠিটাতে টিকিট লাগাতে বলত। চাকরটা পুরোনো টিকিট নিয়ে খামের উপরে লাগিয়ে দিত, আর ও তাই লেটার-বাক্সে ফেলে দিয়ে আসত। তার লেখা চিঠি বিবি সোফিয়ার কাছে লক্ষ্ণৌয়ে নিশ্চয় পৌঁছবে আর সোফিয়ার লেখা এই চিঠির উত্তর সে নিশ্চয় পাবে এই আশায় সে খুব খুশিতে থাকত। চিঠির উত্তরের আশায় থেকে উত্তর না পেয়ে খুব মনমরা আর নিরাশ হয়ে পড়ত।

'যখন আর একটু বয়স বাড়ল আর নিজে ভাঙা ভাঙা কিছু কিছু লেখা শিখল, তখন আবার লক্ষ্ণৌয়ে সোফিয়াবিবিকে আবোলতাবোল ভাষায় নিজেই চিঠি লিখে খামে ভরে আঠা লাগাত। চাকরটাকে পয়সা দিয়ে পোস্ট অফিসের টিকিট আনিয়ে নিজে খামের উপর চিপিয়ে দিয়ে চাকরটাকে দিয়ে বলত যাও এটা তুমি ডাক বাক্সয় ফেলে দিয়ে এসো। চাকরটা ওকে খুশি করার জন্যে খাম ডাকবাক্সয় ফেলার জন্যে নিয়ে যেত কিন্তু ফেলত না। কেননা আমরা তাকে মানা করে দিয়েছিলাম। বাজার থেকে এসে চাকরটা ওকে বলে দিত আমি তোমার চিঠি ফেলে দিয়েছি। এবার নিজের লেখা চিঠির উত্তরের জন্যে দিনের পর দিন অপেক্ষা করে শেষে উত্তর না পেয়ে খুব দুঃখিত আর চিন্তিত হয়ে পড়ত। ওর এই রকম কাজকর্ম অনেকদিন পর্যন্ত ছিল পরে তার একটা চিঠির উত্তরও না পাওয়ায় চিঠি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিল। আমরা চাইতাম যে সে আগের কথা ভুলে যাক। শুধু শুধু পূর্বজন্মের কথা মনে করে ছেলেটা কষ্ট পাচ্ছে।'

প্রশ্ন—'আচ্ছা ! ওর গাড়ির নম্বর আর ওর বলা লক্ষ্ণৌয়ের সব কথা সত্যি ? আপনি নিজে কোনো খোঁজখবর নিয়েছিলেন ?'

উত্তর—'সব কথাই তো অক্ষরে অক্ষরে সত্যি ছিল। ও যে পূর্বজন্মে মুসলমান ছিল এবং লক্ষ্ণৌয়ে থাকত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যখন এর পূর্বজন্মের কথা লোকেরা জানতে পারল তখন একে দেখবার জন্যে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসতে লাগল। কেউ কেউ তো ছেলেটির কথামতো লক্ষ্ণৌয়ের বাড়িটা দশ-বিশ হাজার টাকায় কিনতে চেয়েছিল, যাতে বাড়িতে ঘরে পোঁতা ৯০ হাজার টাকা পেয়ে যায়, কেননা সুভাষ বলেছিল যে সে নব্বই হাজার টাকা মাটিতে পুঁতে রেখেছে, তা পাওয়া যাবে, আরও অনেক জিনিস পাওয়া যাবে। তারা লক্ষ্ণৌয়ে গিয়ে বহু চেষ্টা করেছিল কিন্তু সফল হয়নি। এক ভদ্রলোক ওর বলা কথা অনুযায়ী ওর আগের জন্মের মোটরগাড়ির নম্বর লিখে নিয়ে গিয়েছিল। খোঁজখবর নেওয়ার পর আমাকে জানানো হয় যে তার দেওয়া গাড়ির নম্বর ঠিক ছিল।'

এসব সত্য ঘটনা আমি নিজে লক্ষ্ণৌ গিয়ে আর সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। যে মুসলমান কোনোদিন তিনকালে পূর্বজন্মের কথা সত্যি বলে বিশ্বাস করে না, তাদেরই মধ্যে একজন হিন্দুঘরে জন্ম নিয়ে পুনর্জন্মবাদের সিদ্ধান্ত সবার সামনে ঢাক পিটিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিল।

এ হল সত্য সনাতন ধর্ম আর শাস্ত্র-পুরাণের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, যা এই ঘটনা দ্বারা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

——— ০ ———

পূর্বজন্মের শুভ সংস্কারযুক্ত কুকুর

(১)

ভোলু

পূর্বজন্মের সংস্কারসম্পন্ন অনেক পশুর বিচিত্র ঘটনা মাঝে মাঝে আমাদের চোখে পড়ে।

স্বনামধন্য আর্যসন্ন্যাসী তথা দৈনিক 'মিলাপ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা আনন্দস্বামী সরস্বতী মহারাজের দেরাদুনের তপোবন আশ্রমে এমন একটি কুকুর ছিল যে প্রত্যেকটি একাদশীতে উপবাস করত। স্বয়ং মহাত্মা আনন্দমোহন মহারাজ ওই কুকুরটির সম্বন্ধে অনেক কথা আমাকে বলেছিলেন। এখানে আমি সেই একাদশী পালনকারী কুকুরটির এবং আরও চারটি পূর্বজন্মের সংস্কারসম্পন্ন কুকুরের ঘটনা বলব। এই ঘটনাগুলি আমি চারজন সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান লোকের কাছ থেকে শুনেছি।

আমাদের পিলসুবার বাড়িতে বিশ্ববিখ্যাত আর্যনেতা এবং উত্তর কাশীর সুপ্রসিদ্ধ আর্যসন্ন্যাসী মহাত্মা আনন্দস্বামী সরস্বতী মহারাজ এসেছিলেন, যিনি প্রথম জীবনে 'খুশালচন্দ্র' নামে (সম্পাদক 'মিলাপ') বলে পরিচিত ছিলেন। একদিন আমি তাঁকে তাঁরই পত্রিকার একটি কাটিং নিয়ে দেখিয়েছিলাম আর সেটি তিনি পড়ে দেখেছিলেন। তাতে লেখা ছিল—

গৌহাটিতে এক সরকারি অফিসারের বাসায় 'ভোলু' নামে একটি কুকুর আছে যে মাঝে মাঝে উপবাস পালন করে। কুকুরের মালিকের বক্তব্য যে, 'ভোলু'র কিছু অজানা শক্তি আছে। সে প্রতি পূর্ণিমা, একাদশী আর অমাবস্যায় কিছুই খায় না, ব্রত পালন করে। আমাদের বাড়ির লোকজন অনেক সময় অমাবস্যা, পূর্ণিমা আর একাদশীর কথা ভুলে যায় কিন্তু ভোলু কোনোদিন ভোলে না আর ওই দিনগুলিতে সে একদম খাওয়া-দাওয়া করে না, উপবাস ব্রত পালন করে। এসব দেখে সকলে খুব আশ্চর্য হয়।

এই কথাগুলি পড়ে আর্যসন্ন্যাসী শ্রীআনন্দ স্বামী সরস্বতী মহারাজ বললেন—রামশরণদাস ! এটি গল্প নয়, বরং অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমি নিজে একটি কুকুরকে নিয়মমতো একাদশী পালন করতে দেখেছি। সে মাছ-মাংস কোনোদিন দেখেনি। এ একদম নিজের চোখে দেখা সত্য ঘটনা যা আপনাকে শোনাচ্ছি, শুনুন—

দেরাদুনে শ্রীগুরুমুখ সিংহের প্রতিষ্ঠিত একটি তপোবন আশ্রম আছে। ওই তপোবনে একটি কুকুর আছে, যে প্রত্যেক একাদশীতে উপবাস করে। কুকুরটি নালাপানির বাসিন্দা ঠাকুর শ্রীরামসিংহের পালিত কুকুর। একাদশীর দিন যদি কুকুরটির সামনে রুটি ধরে দেওয়া হয় তাহলে সেদিন কোনোক্রমেও সে রুটি ছোঁয় না, রুটি দেখে দু পা পিছিয়ে যায়। আর যদি তাকে রুটি খাওয়ানোর জন্যে বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়, তাহলে রুটি না খেয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেবে কিংবা রুটিটা মুখে নিয়ে কোনো গাছের নীচে লুকিয়ে রেখে আসবে আর তার ওপর পাথর কিংবা ওই রকম কিছু চাপা দিয়ে দেবে যাতে কেউ ওই রুটিটা দেখতে না পায়। পরের দিন দ্বাদশীতে ব্রতভঙ্গ হলে সেখানে গিয়ে ওই লুকিয়ে রাখা রুটি বার করে খাবে। হাজার রকমের খাবার যদি একাদশীর দিন ওর সামনে পড়ে থাকে তবু সে সেগুলি স্পর্শও করে না। কুকুরটির অল্পেই তুষ্টি আর ব্রত পালনে নিষ্ঠা দেখে সকলেই আশ্চর্য হই আর ভাবি যে ও কী করে জানতে পারে যে আজ একাদশী। এ কেমন করে হয় তা ভগবানই জানে, শুধু একদিনের একাদশী ব্রত নয় ওকে সমস্ত একাদশী পালন করতে দেখা গেছে। কর্মফলের সিদ্ধান্ত অনুসারে অনুমান করা যায় যে পূর্বজন্মে ও কোনো মানুষ ছিল আর তখন নিয়মমতো একাদশীর ব্রত পালন করতো। কোনো দোষে হয়তো এই জন্মে কুকুরযোনিতে জন্ম হয়েছে। কিন্তু কুকুরের এই দেহেও তার সূক্ষ্মশরীর, পূর্বজন্মেরই একাদশী পালনের সংস্কার রয়ে গেছে ! সেই পূর্বসংস্কারই একাদশীর দিনে জেগে ওঠে ! বাস্তবে এটা কিন্তু খুবই আশ্চর্যজনক যে একাদশীর কথা সেদিনই তার মনে পড়ে যায়। কুকুরটার আর একটা বিশেষত্ব এই যে সে ভুল করেও কখনো কোনো

পশুর মাংস খায় না। যদি ওর সামনে মাংস ধরা হয়, তবে ও মাংস তো খায়ই না বরং মুখ তুলে সরিয়ে নেয়, ঘৃণা দেখায়। কুকুরটি শক্ত শুকনো রুটি যা পায় তাই খেয়ে দিন কাটায়। এসব ঘটনার কী যে রহস্য তা ভগবানই জানেন, কিন্তু এ আমার নিজের চোখে দেখা বাস্তব ঘটনা।'

আর্যসন্ন্যাসীর এই কুকুরের একাদশী ব্রত পালনের ঘটনা শুনে অনেকে আশ্চর্য হতে পারেন, কিন্তু এ ঘটনা একদম বাস্তব সত্য।

এই অদ্ভুত ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে হিন্দুমাত্রেরই একাদশীর ব্রত পালনপূর্বক ঈশ্বরকে ভক্তি করা এবং অখাদ্য-কুখাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা উচিত।

(২)

সোম ব্রতধারী এক কুকুরের কাহিনী

আমি প্রসিদ্ধ আর্যসন্ন্যাসী, বিদ্বান শ্রীস্বামী কেবলানন্দজী মহারাজের আশ্রমে বছরখানেক ছিলাম। সেখানে একটা কুকুর ছিল যে প্রত্যেক সোমবারে উপোস করত। স্বামীজী বলেছিলেন যে, এটা খুব আশ্চর্যের কথা যে কুকুরটা কী করে জানতে পারে যে, আজ সোমবার। সোমবার দিন কুকুরটা সারাদিন না খেয়ে সম্পূর্ণ নিরাহারে থাকত। যদি সেদিন তাকে খাবার দেওয়া হত আর খাওয়াবার জন্যে চেষ্টা করা হত তাহলে সে রুটিটা মুখে করে নিয়ে গোপনে চুপচাপ কোথাও রেখে আসত আর পরের দিন সেটা খেত। এ আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা।

(৩)

হনুমানভক্ত কুকুর

আর্যসমাজের প্রসিদ্ধ বিদ্বান মাননীয় শ্রীশুকদেব শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ বলেছিলেন 'আমার ছোট বোনের বিয়ের দিন ছিল, আর বিয়েতে আমার মামা ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিলেন। তার টাঙ্গার পেছনে পেছনে বারো ক্রোশ দূর থেকে হেঁটে একটি কুকুরও এসেছিল। আমার

জ্যাঠামশায় সেটাকে একটা গাঁয়ের নেড়ি কুকুর মনে করে লাঠি দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে দিয়েছিলেন। এতে কুকুরটা খুব চিৎকার করে ওঠে। কুকুরটার চিৎকারের শব্দ শুনে মামাবাবু দৌড়ে আসেন এবং খুব উত্তেজিত হয়ে তাঁকে বলতে শোনা যায়—'এ আমার অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ কুকুর। আজ এর ব্রত আছে, পায়ে হেঁটে এ বারো ক্রোশ রাস্তা এসেছে।' ঘরে মেয়ের বিয়ে তাই ও উপবাস করে আছে। আর যতক্ষণ না কন্যা সম্প্রদান হচ্ছে ততক্ষণ ও কিছুই খাবে না। মামাবাবুর এইকথা আমার বিশ্বাস হয়নি, আর আমরা গাঁজা-গপ্পো মনে করে তাচ্ছিল্য করেছিলাম। মামাবাবু বলেছিলেন—'এটি আপনারা পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারেন। অনেক রকম মিষ্টি, লুচি, কচুরি ইত্যাদি তো তৈরি হয়েছে, আপনারা এর সামনে ধরে দিয়ে দেখতে পারেন ও খায় কী না!' তখন বাড়ি থেকে লুচি, কচুরি ইত্যাদি নিয়ে এসে কুকুরটার সামনে ধরে দেওয়া হল। কিন্তু খাওয়া তো দূরের কথা কুকুরটা সে সব ছুঁলো না পর্যন্ত আর সেখান থেকে দূরে পালিয়ে গেল। যখন সন্ধ্যার পর কন্যা সম্প্রদান সম্পন্ন হল আর আমরা, মামা এবং অন্যান্যরা খেতে আরম্ভ করলাম তখন সেই কুকুরটিকেও খাবার দেওয়া হল আর সে তৎক্ষণাৎ খেতে আরম্ভ করে দিল। তাই দেখে আমরা সকলেই খুব অবাক হয়ে গেলাম।

মামা বললেন—'এই কুকুর হনুমানের খুব ভক্ত আর প্রত্যেক মঙ্গলবারে ও ব্রত পালন করে।' আমরা পরীক্ষা করবার জন্যে মামাকে মঙ্গলবার পর্যন্ত আটকে রাখলাম। সোমবারে রাত্রে কুকুরটা খেয়ে নিল, কিন্তু মঙ্গলবার দিন ওর সামনে খাবার দিলে দেখা গেল সে ওসব না ছুঁয়ে পিছিয়ে গেল। পরের দিন বুধবার ওর সামনে যখন খাবার ধরে দেওয়া হল তখন দেখা গেল ও দিব্যি খেতে আরম্ভ করেছে।

(৪)

ভগবদ্ভক্ত কুকুর

সুপ্রসিদ্ধ যাজ্ঞিক জ্যোতিষাচার্য পণ্ডিত শ্রীরাম শাস্ত্রী মহারাজ

বলেছিলেন—আমাদের ঘরে প্রকৃত ধর্মপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত একটি কুকুর ছিল। ওর নাম ছিল 'নাগরী দাস'। ও ভগবানের কীর্তন শুনতে শুনতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠত। প্রতি রবিবার আর প্রতি বছর জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি আর রামনবমীর দিন সারাদিন নিয়মমাফিক সে উপবাস করে থাকত।

আমার বাবা পণ্ডিত দয়ারাম কবিরাজি চিকিৎসা করতেন আর অত্যন্ত নাম-করা বৈদিক যাগযজ্ঞকারী বলে তার খ্যাতি ছিল। একদিনের কথা, তিনি রাত্রে এক হরিজনের ঘরে একটি কুকুরছানাকে মরার মতো পড়ে থাকতে দেখেন। কুকুরছানাটাকে দেখে কী জানি বাবার মনটা ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেল আর চোদ্দো টাকা দাম দিয়ে সেটাকে তিনি কিনে বাড়ি নিয়ে এলেন। তখন আমার ঠাকুরদাও বেঁচে ছিলেন। তিনিও ওই বাচ্চাটাকে খুব ভালবেসে ফেলেছিলেন। তিনি তার থাকার জন্যে একটা ছোট ঘর তৈরি করিয়ে আর রোজ দুধ-রুটি দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি সর্বদা খেয়াল রাখতেন যেন কুকুরছানাটার যাতে এতটুকু কষ্ট না হয়। কুকুরটার প্রতি বাড়ির সকলের একটা টান গজিয়ে গিয়েছিল। কারণ দেখতে ও একটা সাধারণ কুকুরের মতো ছিল বটে, কিন্তু তার স্বভাবটি ছিল যেন একজন নিষ্ঠাবান সদাচারী ব্রাহ্মণের মতো। মনে হয় পূর্বজন্মে ও কোনো যোগী ছিল আর কোনো পাপের ফলে কুকুরযোনি প্রাপ্ত হয়েছিল। ও প্রতি রবিবারে নিয়মপূর্বক উপোস পালন করত। উপবাসের দিনে ওকে খাবার দিলেও খেত না। বাড়িতে যেদিন জন্মাষ্টমী, রামনবমী, শিবরাত্রির পুজো হত সেদিন সারাদিনও ব্রত পালন করত, ভুলেও কিছু খেত না। কী জানি কীভাবে সে রামনবমী, জন্মাষ্টমী বা শিবরাত্রির দিন মনে রাখত। ওই তিনদিন ব্রত রাখার মানে এও হতে পারে সে রাম, কৃষ্ণ এবং শিবের মধ্যে কোনো ভেদ মনে করত না। রাস্তার পাতা-চাটা কুকুরের মতো সে নেড়ি কুকুর ছিল না। ও কারো এঁটো খাবার খেত না। ব্রাহ্মণের ঘরের শুকনো বাসি রুটি শুদ্ধ পবিত্র খাবার যা পেত তাই খেয়ে সে সন্তুষ্ট থাকত। কুকুরটা অত্যন্ত সংযমী আর নির্লোভ ছিল।

কোনো জীবের প্রতি হিংসা করত না আর মাছ-মাংস প্রভৃতিও খেত না।

কুকুরটার ভাগবত কথা শোনার খুব আগ্রহ ছিল। যেখানে ভাগবতের কথা হত সে সেখানেই চলে যেত, আর দূরে বসে একমনে খোস মেজাজে তা শুনতে থাকত। ভগবানের লীলা-কথা শুনে ও এত মগ্ন হয়ে যেত যে দেহ-মন যেন হারিয়ে ফেলত। আর চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়াত। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনের প্রসঙ্গ শুনে সে এতই চঞ্চল হয়ে পড়ত যে ভগবদ্ভক্ত মানুষের মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠত। তাকে দেখে সকলেই তার প্রশংসা করত আর নিজেদের মধ্যে ভগবানের প্রতি ওর মতো টানের অভাব দেখে ধিক্কার দিত।

(৫)

নিরামিষাশি এবং স্বল্পে সন্তুষ্ট একটি কুকুরের কাহিনী

জ্যোতিষপীঠ বদরিকাশ্রমের পরম পূজনীয় মহাত্মা দণ্ডীস্বামী শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহারাজ একবার আমাকে বলেছিলেন—'আমি তখন গৃহস্থাশ্রমে ছিলাম। আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কুলীন বংশ। অনেক ব্রাহ্মণ আমাদের যজমান ছিল এবং আমাদের গুরুর মতো সম্মান দিত। একদিনের কথা, আমাকে নৈনিতালের সিরওয়া গ্রামে আমাদের এক ভক্তের বাড়িতে যেতে হয়েছিল, তখন আমি স্বপাক রান্না করে খেতাম আর সেদিন ওখানে তক্তায় বসে নিজের খাবার তৈরি করছিলাম। ভক্তটি আমার এই নিয়ম জানত, তাই সে রান্নার জন্যে আটা, ঘি, চিনি ইত্যাদি সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। আমি রান্না করে ইষ্টদেবকে ভোগ নিবেদন করে খেতে বসলাম। খাওয়ার পর লক্ষ করলাম একটু দূরে একটা কুকুর বসে আছে। আমি একটা রুটি নিয়ে কুকুরটার সামনে ধরে দিলাম কিন্তু কুকুরটা আমার দেওয়া রুটিটার দিকে চেয়ে তাকিয়েও দেখল

না। আমার খুব আশ্চর্য লাগল যে কুকুর তো রুটি দেখলেই দৌড়ে যায় আর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে খায়, কিন্তু এ সামনে পড়ে থাকা সত্ত্বেও রুটিটা ছুঁচ্ছে না ? আমি এই কথা চিন্তা করছি আর তখনই সেই ভক্ত ব্রাহ্মণটি বাইরের থেকে এসে বাড়িতে ঢুকল। আমি জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল—'কেউ তাকে যত শুদ্ধ আর ভালো ভালো খাবারই খেতে দিক না, তবু এই নির্লোভ কুকুরটি খিদেয় মরে গেলেও কারো হাতের ছোঁয়া কিছু খায় না। স্বপাকি, সদাচারী এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারও হাতের খাবার এই কুকুরটি কিছুতেই খায় না। আমরা সবাই যে আচার-বিচার মেনে চলি সে কথা কুকুরটা জানে, তাই আমাদের ঘরের ছাড়া অন্য কারোর ঘরের খাবার ও খায় না। আপনি যে আমাদের গুরু এবং শুদ্ধ আচারসম্পন্ন—তা এই কুকুরটি জানে না এবং সেজন্যই সে আপনার হাতের রুটি খায়নি। যদি খাবার সম্বন্ধে কুকুরটির বিশ্বাস হয় তাহলে সে অবশ্যই রুটি খেয়ে নেবে।'

আমি বলায় ভক্তটি বেশ করে কুকুরটিকে বুঝিয়ে বললে—'শোনো ! ইনিও ব্রাহ্মণ এবং আচার-বিচারপরায়ণ, সদাচারী এবং ধর্মপালনকারী। আমাদের গুরুদেব এবং আমাদের থেকেও অনেক শ্রেষ্ঠ। আর ইনি নিজে রান্না করে খান। এই রুটি উনি নিজের হাতে তৈরি করেছেন অতএব তুমি এটি খেয়ে নাও।' এত কথা কুকুরটি চুপচাপ শুনতে লাগল কিন্তু এতটুকু নড়ল না। আবার যখন ভক্তটি বলল—'আমরাও এঁর হাতের রান্না খাই, তুমিও খেয়ে নাও। একথা সত্যি, আর তুমি দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে খেয়ে নাও।' এত কথা বলার পর কুকুরটার বিশ্বাস হল এবং সামনে পড়ে থাকা রুটিটা খেয়ে নিল। আমি জিজ্ঞাসা করলে ভক্ত বলল—'আমার এই কুকুরটি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, সাত্ত্বিক, নির্লোভ, সাধুস্বভাব, সদাপ্রসন্ন আর কঠোর সংযমী।' ও অত্যন্ত ভগবদ্‌প্রেমী। কুকুরটি কোনোদিন জীবহিংসা করে না, কখনো মাংস খায় না আর আমিষাশি কারোর হাতের খাবারও খায় না। কোথাও ভালো ভালো খাবার দেখলেও এর লোভ হয় না এবং নিয়ম-পালনে খুবই সতর্ক।

একবার নদীতে বান এসেছিল আর এই পরম ভগবদ্ভক্ত কুকুরটি বানে ভেসে গিয়েছিল। উঠে আসবার অনেক চেষ্টা করেও উঠে আসতে পারেনি। আর ভাসতে ভাসতে অন্য গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। অন্য গাঁয়ে তো পৌঁছে গেল, প্রাণেও বেঁচে গেল কিন্তু কোথাও কিছু খায়নি। তিন চারদিন ধরে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকল। গাঁয়ের লোক ওকে খাওয়াবার অনেক চেষ্টা করল কিন্তু ও কিছুই খেল না। তিন-চারদিন পর বানের জল কমায় নদীর বেগও কমে এল তখন খিদেয় তেষ্টায় এ গাঁ সে গাঁ করে ঘুরে ঘুরে একদিন আমাদের গ্রামে ফিরে এল। খিদের জ্বালায় ও একদম শুকিয়ে গিয়েছিল আর মাইলের পর মাইল হেঁটে এসে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমরা খুবই আদর করে কুকুরটিকে খাইয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

খুবই অদ্ভুত ব্যাপার এই যে কুকুরটি খুব অল্পে সন্তুষ্ট থাকত। এই সদাচারী কুকুরটি ব্রাহ্মণ ছাড়া কোনো ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ঘরের খাবারও খেত না। অভুক্ত থেকেও কষ্টের সঙ্গে নিয়মপালন করত। সম্ভবত পূর্বজন্মে এ কোনো সাধক বা সদাচারী ব্রাহ্মণ ছিল।

খুব সংক্ষিপ্তভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করা হল। এতে প্রমাণিত হয় যে পূর্বজন্মের শুভ সংস্কার পরবর্তী যেকোনো জন্মেও জীবের সঙ্গে থাকে এবং তাকে তদনুরূপ আচরণ করতে প্রেরণা দেয়। কোনো জন্মের ফলস্বরূপ সে যদি নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে তাহলে সেই জন্মের ভোগ সমাপ্ত হওয়ামাত্র সে পরে উন্নতকুলে জন্মগ্রহণ করে পুনরায় সাধনে রত হয়ে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। অতএব মানুষের কায়মনোবাক্যে সর্বদা সাত্ত্বিক কর্ম করা উচিত যাতে সাত্ত্বিক সংস্কার বদ্ধমূল হয়।

--- ০ ---

পাপের ফল অবশ্যই ভুগতে হবে, ঈশ্বরের বিচারে অন্যথা হয় না

('সাধুবেলা' আশ্রমের জনৈক সাধুর জীবনে ঘটিত সত্য ঘটনা)

সুপ্রসিদ্ধ বিরাগী সাধু স্বামী রামেশচন্দ্র একবার পিলখুবায় এসেছিলেন। তিনি সৎসঙ্গে বলেছিলেন যে, এক যোগী তাঁকে আদেশ করেছিলেন, আমি যেখানেই যাই সব জায়গায় যেন তাঁর জীবনের ঘটনাবলী শোনাই। 'আমি কী কী মহাপাপ করেছি, আর তার ফল কীভাবে ভোগ করেছি', সকলকে শুনিয়ো আর আমার হয়ে তাদের সাবধান করে দিয়ে বলবে— 'মিথ্যা, প্রতারণা, জালসাজি, বেইমানির ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। মনে রেখো তোমাদের টাকাকড়ি ধনদৌলত এখানেই ছেড়ে যেতে হবে, সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। ভগবানের বিচারে পাপের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আমাদের দেরি মনে হলেও তাঁর বিচার তাঁর বিধানমতোই হয়। তোমার কর্ম অনুযায়ীই তুমি ফল পাবে। তুমি যার কাছ থেকে নিয়েছ তাকে পাই-পয়সা শোধ করে দিতে হবে।'

ওই যোগীসাধক তাঁকে বলেছিলেন, 'আমার গৃহস্থাশ্রমে টাকাপয়সার খুব অভাব ছিল, আর আমার সন্তানাদিও ছিল না। আমি খুব চিন্তায় থাকতাম আর দিনরাত ভগবানকে ডাকতাম। একদিন আমার ওপর তাঁর কৃপা হল। আমি একজন বন্ধু পেলাম, যে আমাকে বলল, 'আমি টাকা খাটাব আর তোমাতে-আমাতে মিলে একটা শেয়ারের ব্যবসা করব।' আমি রাজি হয়ে গেলাম আর দুজনে মিলে ব্যবসা আরম্ভ করে দিলাম। ভগবানের এমনই কৃপা যে, আমরা সেবারে বোম্বাই-এ উলের গাঁটের সওদা করেছিলাম তাতে আমাদের এক লাখ টাকা লাভ হয়ে গেল। বোম্বাই থেকে আমাদের কাছে খবর এল যে, 'তোমাদের সওদাতে এক লাখ টাকা লাভ হয়েছে, এই টাকা তোমরা এসে নিয়ে যাও।' আমাদের খুব আনন্দ হল, আর আমরা দুজনেই টাকা আনতে বোম্বাই রওনা হলাম। বোম্বাই

পৌঁছে আমরা একটা হোটেলে উঠলাম, আর সারাদিন বোম্বাই-এর এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ালাম। আমার বন্ধু বলল, 'এখনও তো দু-তিন দিন এখানে থাকব, বোম্বাই যখন এসেছি তখন আচ্ছা করে ঘুরে নিই, কারণ রোজ রোজ তো আসা হবে না।' সেইমতো আমরা দু-দিন ধরে বোম্বাই শহর ঘুরে ঘুরে দেখলাম। খুব ঘুরলাম আর অনেক কিছু দেখলাম। তারপর আমরা মহাজনের কাছে গিয়ে এক লাখ টাকাটা নিয়ে হোটেলে চলে এলাম। আমার মনের মধ্যে পাপের উদয় হল। আমি ভাবলাম কী, যদি এই বন্ধুকে মেরে ফেলি তো সব টাকাটা আমার হয়ে যাবে। আমি মনে মনে তাকে মেরে ফেলবার পরিকল্পনা করলাম। রাত্রে হোটেলের ঘর থেকে বেরিয়ে চুপি চুপি বাজারে চলে গেলাম। বাজার থেকে বিষ কিনে এনে সেটা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে বন্ধুকে খাইয়ে দিলাম। বেচারা বিষ মেশানো দুধ খেয়ে নিল। সে আমার মনের পাপের কথা কী করে জানবে ? সেই রাত্রেই তার মৃত্যু হল। আমি সকালবেলা বাজারে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে এনে তাতে মৃত সঙ্গীকে অসুস্থ বলে চাপিয়ে শুইয়ে দিলাম। ট্যাক্সিটিকে সোজা সমুদ্রের ধারে নিয়ে গেলাম। তারপর ওই মৃত সঙ্গীকে গাড়ি থেকে আস্তে আস্তে বার করলাম। ড্রাইভারকে একশো টাকা বকশিশ দিয়ে বিদায় করলাম। ভালো করে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে ওকে সমুদ্রে ফেলে দিলাম। আমি এক লাখ টাকা নিয়ে আনন্দে আর খোশমেজাজে ঘরে ফিরে এলাম।

আমার আসার খবর পেয়ে আমার অংশীদার বন্ধুর স্ত্রী ছুটে এল। সে দৌড়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা ! আমার স্বামী আপনার সঙ্গে বোম্বাই গিয়েছিল, তাকে কোথায় রেখে এলেন ? তার কী হয়েছে ?' আমি কপট দুঃখপ্রকাশ করে কাঁদতে আরম্ভ করলাম, আর কান্নাভেজা গলায় বললাম, 'খুবই দুঃখের কথা। বোম্বাই-এ গিয়ে ওর কলেরা হয়ে গেল, আর তাতেই বমি করতে করতে মারা গেল।' আমি তার স্ত্রীকে দশ হাজার টাকা দিলাম। তাতে সে আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করল। আর টাকা পেয়ে সে আমাকে সৎ, ধার্মিক বলে মনে করল। আমার দুষ্কর্মের কথা সে বেচারি কী করে জানবে। সে বুঝতেই পারল না যে, আমিই তার স্বামীকে

মেরে ফেলেছি এবং তার ভাগের চল্লিশ হাজার টাকা হজম করে নিয়েছি। দশ হাজার টাকা পেয়ে সে আমার মতো পাপীকেও ধার্মিক এবং দানবীর মনে করল। আমি আনন্দে বাস করতে লাগলাম। আনন্দের বাঁশি বেজে উঠল। আমার কোনো সন্তান ছিল না। এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আমার একটি সুন্দর ছেলে জন্মাল। আমি খুবই সুখী হলাম আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম, আমার অংশীদার বন্ধুকে মেরে ঠিক কাজই করেছি। আমার অনেক টাকাপয়সা হল, আবার ছেলেও হল, ভাবলাম ভগবানের কী দয়া ! ছেলেকে ভালো ভালো খাবার খাইয়ে আদরযত্ন করে মানুষ করতে লাগলাম। আনন্দে, খুশিতে দিন কাটাতে লাগলাম। আস্তে আস্তে ছেলে বড় হল। লেখাপড়া শিখতে লাগল। লেখাপড়ায় এত ভালো ছিল যে তাকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলেতে পাঠিয়ে দিলাম। ছেলের বিয়ের বয়স হল। ছেলে পড়তে বিলেত গেছে এই কথা চারদিকে রটনা হয়ে গেছে। চার দিকের ভালো ভালো ঘর থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগল। কেউ বিশ হাজার টাকা দিতে চায় তো আর একজন পঞ্চাশ হাজার আগেই দেবার কথা বলে। আমার পুরোপুরি বিশ্বাস যে একলাখ টাকা তো বিয়েতে পণই পাব, আর বিয়েতে অন্যান্য সামগ্রীও পাব। ছেলে বিলাত থেকে পড়ে ফিরে এল। একদিন সে রাত্রে সিনেমা দেখে ফিরল আর সেই রাত্রেই তার জ্বর এল। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। খুব বড় একজন ডাক্তারকে ডেকে এনে তাকে দেখালাম। ডাক্তার বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই। ছেলে রাত জেগেছে, না ঘুমোনোর জন্যে জ্বর এসেছে, জ্বর ছেড়ে যাবে।' তারপর ডাক্তার ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন। সকালে দেখা গেল জ্বর ১০৪ ডিগ্রি উঠেছে। আমার খুব ভয় ধরে গেল। আবার খানিক পরে দেখলাম জ্বর ১০৬ ডিগ্রিতে উঠেছে। আমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেল। আমি শহরের বড় বড় সব বিখ্যাত বিখ্যাত ডাক্তার নিয়ে এলাম। তাঁরা ভালোভাবে পরীক্ষা করে জানালেন যে আপনার এই ছেলে হয়তো বাঁচবে না। এর ক্যান্সার হয়েছে। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম আর কেঁদে ডাক্তারদের পায়ে ধরে বললাম, 'যত টাকা খরচ হয় হোক কিন্তু আপনারা আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিন।' ডাক্তাররা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে আমাকে বললেন, 'একে

যদি বিদেশে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান তাহলে হয়তো বাঁচতে পারে।' আমি তাকে আমেরিকায় নিয়ে গেলাম আর সেখানে একবছর ধরে ছেলের চিকিৎসার পেছনে জলের মতো টাকা খরচ করলাম। একবছর পর সেখানকার ডাক্তারও জবাব দিয়ে দিলেন এবং আমাকে ডেকে বললেন 'আপনার এই ছেলে আর মাত্র কয়েকদিন বাঁচতে পারে। আপনি যদি মনে করেন তাহলে ওকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।' আমি মাথা ঠুকে কাঁদতে লাগলাম আর ছেলেকে নিয়ে দেশে ফিরে এলাম। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব যে যেখানে ছিল শুনে সবাই দেখতে এল। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি দুঘন্টা আগে থেকেই কাঁদাকাটা করতে করতে মাথায় হাত চাপড়াতে চাপড়াতে ছেলের কাছে এলাম আর তার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, 'বাপ ! একবার চোখ খোল ! ' তখন সে আমার ডাক শুনে পুরো চোখ মেলে হাসল। ছেলের মৃত্যুর মুখে হাসি দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমি কাঁদতে কাঁদতে তার হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাবা ! তুই হাসছিস কেন ?' ছেলে বলল, 'তুমি আমাকে এখনও চিনতে পারলে না, আমি কে ? আরও ভালো করে তাকিয়ে দেখো, আমাকে চিনতে পার কি না ? আমি তোমার সেই অংশীদার বন্ধু থাকে তুমি ছলনা করে বোম্বাইয়ের হোটেলে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছিলে। এখন আমি তোমার সব টাকা পইপই করে মিটিয়ে নিয়েছি। এখন মাত্র পাঁচ হাজার টাকা বকেয়া আছে, ওটা আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় লাগিয়ে দিয়ো।' এই কথা বলতে বলতে ছেলেটা চোখ বুজল—মরে গেল। আমি খুব ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখলাম সেই অংশীদারের মুখ আমার ছেলের মধ্যে দেখা গেল। আমি কান্নাকাটি করতে করতে ওকে নিয়ে গিয়ে অন্তেষ্টি ক্রিয়া করলাম আর শ্মশান থেকে সোজা জঙ্গলের পথ ধরলাম। জঘন্য পাপের ফল কেমন করে ভোগ করতে হয় আমি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।'

জঘন্য পাপকর্মের দ্বারা উপার্জনকারী লোকদের এই সত্য ঘটনা শুনেও কি চোখ খুলবে না ?

———— ০ ————

যমদূত দর্শন

১৯৬৭ সালের কথা। আমরা 'হাপুড়' সনাতনধর্ম সম্মেলনে গিয়েছিলাম। হাপুড়ের বয়ঃবৃদ্ধ কংগ্রেস নেতা এবং ইউ. পি. বিধান পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য মাননীয় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণবাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্যে তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হতে হতে তাকে আমি শাস্ত্র উল্লেখ করে পুরাণের থেকে কিছু গল্প শোনাই। সেই গল্প শুনে হঠাৎ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণবাবু বলে উঠলেন, 'দেখুন ভক্ত রামশরণদাসজী ! আমি আপনাদের শাস্ত্র-পুরাণের কথা বিশেষ জানি না। কারণ শাস্ত্র-পুরাণ আমি কোনোদিন চোখেও দেখিনি। আমি তো অনেক দিন কংগ্রেসে আছি, আমার দ্বারা যা কিছু কাজ হয়েছে সে সব আমি নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবার জন্যেই করেছি। আমার জীবনে ওই ধরনের দু-একটা ঘটনা আমি অবশ্যই দেখেছি। আর এই সব ঘটনা নিজের চোখে দেখে আমারও শাস্ত্র-পুরাণের প্রতি কিছু শ্রদ্ধা জন্মেছে।'

তখন আমি তাঁকে তাঁর জীবনে কী এমন আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছিল তা জানবার জন্যে সে সম্বন্ধে তাঁকে বলতে অনুরোধ করি।

তিনি বললেন, আমি একবার দুজন অত্যন্ত ভয়ংকর, বিশালাকার কালো চেহারার লোককে দেখেছিলাম, তারা ভূত না যমদূত তা জানি না, তবে আজও যদি তাদের ভুলেও কোনোদিন মনে করি তো আমি ভয়ে আঁতকে উঠি।

১৯২৭-২৮ সালের কথা। আমি সেই সময় কংগ্রেসে কাজ করতাম। প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা শ্রীমহাবীর ত্যাগীর দাদা ধরমবীর ত্যাগী সেই সময় মীরাট কলেজে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপক ধরমবীর হঠাৎ অসুস্থ

হয়ে পড়েন। তাঁর ঘন ঘন হেঁচকি উঠতে থাকে। মীরাটের ডাক্তার করালীকে দিয়ে তাঁর চিকিৎসা করানো হচ্ছিল। যখন তাঁর অবস্থা খুব খারাপের দিকে তখন সর্বক্ষণের দেখাশোনা করার জন্যে কয়েকজন নিষ্ঠাবান লোকের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিল। তার ওখানে লোকজনের খুব অভাব থাকায় আমরা কয়েকজন হাপুড় থেকে তাঁর সেবাযত্ন করার জন্যে মীরাট চলে গেলাম। সেই সময় অধ্যাপক সিপট বাজারে চৌধুরী রঘুবীরনারায়ণ সিংহের বাড়িতে ছ-তলার ঘরে থাকতেন। আমাদেরকে তাঁর দেখাশোনার জন্যে যে ভার দেওয়া হয়েছিল সেই মতো আমরা কাজ করছিলাম। দু-তিন দিন বাদে অধ্যাপকের অবস্থা আগের থেকে আরও খারাপ হয়ে পড়ল। ডাঃ করালী যখন অধ্যাপককে দেখতে এলেন তখন উনি আমাদের ডেকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'আজকের রাতটা অধ্যাপকের পক্ষে খুব মারাত্মক। আজকে আপনারা তাঁর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। তেমন কিছু বুঝলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবেন।'

এই কথা শুনে তো আমাদের খুব চিন্তা ধরে গেল। আমরা সে রাত্রে পালা করে জাগব বলে নিজেদের মধ্যে ডিউটি ভাগ করে নিলাম। তিন ঘণ্টা করে ডিউটি ভাগে পড়ল। ধরমবীর ত্যাগীর স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রি একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত আমার ডিউটি পড়েছিল।

ডিউটির সময় আমার প্রস্রাব পায়। আজকালকার মতো সে সময় ইলেকট্রিক আলো ছিল না। আলোর জন্যে হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে, বউদিকে বলে, বাইরে গেলাম। বাইরে এসে প্রস্রাব করার জন্যে যেই নালার ধারে বসেছি, দেখি কী দুজন ভয়ংকর বিশালাকার, অন্তত সাত ফুট লম্বা লোক নালার ওপাশটায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের সারা শরীর মিশমিশে কালো আর তারা বেশ শক্তসমর্থ বলে মনে হল। তাদের চোখগুলো লাল জবা ফুলের মতো। ওদের দেখে আমার খুব ভয় ধরে গেল

আর অজান্তেই থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। আমার সারা জীবনে এর আগে অমন বিশালাকার ভয়ংকর মানুষ কোনোদিন তো দেখিইনি আর তারপরেও আজ পর্যন্ত কোনোদিন দেখলাম না। জানালা দিয়ে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখলাম তারা দুজন সেখানে আর নেই, অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা এই যে, ঠিক তারপর থেকেই অধ্যাপক ধরমবীরের অবস্থা একটু একটু করে ভালো হতে লাগল। তিনি ক্রমশ সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। ডাঃ করালীও এই দেখে বেশ অবাকই হয়ে গিয়েছিলেন।

——— ○ ———

একাদশীর মাহাত্ম্য

(শ্রীমদ্‌জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য জ্যোতিষ্পীঠাধীশ্বর ব্রহ্মলীন পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীকৃষ্ণবোধাশ্রম মহারাজের শ্রীমুখ থেকে শোনা এক ঘটনা)।

যখন আমাদের প্রিয় ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষ অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে খুব উন্নত ছিল, তখন প্রতিটি হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ সনাতন ধর্ম এবং বর্ণাশ্রম ধর্মের মর্যাদা অনুসারে জীবনযাপন করত। সেই সময় প্রায় প্রতিটি ধার্মিক ব্যক্তি একাদশীর ব্রত-উপবাস পালন করত এবং তা পরম ধর্ম বলে মনে করত। তারা সেদিন ভুলেও অন্নগ্রহণ করত না। একাদশীর দিনে অন্নগ্রহণ করাকে পাপ বলে মনে করত। একাদশীর দিনে খাবারের মধ্যে পাপের স্পর্শ লাগে এই মনে করে তারা অন্নগ্রহণ না করে রাত্রি জেগে ভগবানের নাম-সংকীর্তন ইত্যাদি দ্বারা নিজের জীবনকে সার্থক করার চেষ্টা করত।

বেশিরভাগ হিন্দু পরিবার একাদশী-ব্রত পালন করলে কম করে একশো কোটি মানুষের একদিনের খাবার বেঁচে যেত। ঘরে বসে এই মহাপুণ্য লাভ আর সমাজসেবার এমন সুযোগ আপনাআপনি হয়ে যেত।

একাদশীর ব্রত পালনে পেটের বহু রোগ আপনিই সেরে যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের মধ্যে কিছু লোক এই ধর্মের দেশে জন্ম নিয়ে এবং এখানকার অন্নজল গ্রহণ করেও নিজের অজ্ঞতার বশে নিজেদের সংস্কৃতি এবং সনাতন হিন্দুধর্মের রীতিনীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে বিন্দুমাত্রও লজ্জা করে না। একাদশীর ব্রত উপবাসের কী অদ্ভুত মাহাত্ম্য সে সম্বন্ধে এক অতি আশ্চর্যজনক সত্য ঘটনা আমি পাঠকগণের সামনে উপস্থাপন করছি। আশাকরি শ্রদ্ধাবান পাঠকবৃন্দ দয়া করে এই বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে পড়বেন।

একবার প্রাতঃস্মরণীয় জ্যোতিষপীঠের শঙ্করাচার্য শ্রীকৃষ্ণবোধাশ্রমজী মহারাজ বিশ্বনাথপুরী কাশীতে এসেছিলেন। ওইদিন একাদশী তিথি ছিল।

পূজ্যপাদ আচার্যদেব শাস্ত্রের নিয়মানুসারে একাদশীর দিন নিজে নিরাহারে থেকে অন্যান্য ভক্তদেরও একাদশী-ব্রত পালনের জন্যে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। আর এই একাদশীর ব্রত পালনের উপদেশ দেওয়ার সময়ই তিনি বলেছিলেন, একাদশীর দিন অন্নজল গ্রহণ করা যেমন পাপ তেমনি চা, পান, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা আরও পাপ। সে আবার কেমন একাদশী-ব্রত, যে চা, তামাক ইত্যাদি খাওয়া যায় ? চা, তামাক, গাঁজা ইত্যাদি খেলে তমোগুণ বাড়ে আর শুভকাজ সফল হয় না। সুতরাং এইসব তামস বৃত্তি থেকে দূরে থাকতে হবে। ঘোর কলিকালে একাদশী-ব্রত পালনের সময় 'রাম-নাম', 'শ্রীকৃষ্ণের নাম', 'শিবের নাম' জপ করা, প্রতিদিন সূর্যার্ঘ্য দেওয়া এবং গঙ্গাস্নান করা, কীর্তন শোনা, আপন আপন বর্ণাশ্রম অনুযায়ী সাত্ত্বিক এবং সচাদারপরায়ণ হয়ে দিন কাটানো একান্ত প্রয়োজন। প্রতিদিন গো-সেবা করা কল্যাণের সহজ পথ।

একদিন আচার্যদেব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসা এক ব্রহ্মচারীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ব্রহ্মচারী ! আপনি আজ একাদশীর ব্রত করেছেন ?'

ব্রহ্মচারী—'না বাবা ! করিনি তো !'

আচার্যদেব—'সে কি ! হিন্দু হয়ে, উপরন্তু ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নিয়ে আর ব্রহ্মচারী হয়েও আপনি একাদশীর ব্রত করেননি ? এ তো বড় আশ্চর্যের কথা।'

ব্রহ্মচারী—'বাবা ! একাদশীর ব্রত তো আমি কোনোদিনই করি না।'

আচার্যদেব—'হ্যাঁগো ! তাহলে আপনি কেমন হিন্দু ? কী রকমের ব্রহ্মচারী, আর কী ধরনের ব্রাহ্মণ যে একাদশীর ব্রতও করতে পারেন না ?'

একাদশী-ব্রত পালন করার যে এক বিশেষ অদ্ভুত মাহাত্ম্য আছে, সে সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্র-পুরাণে অনেক কথা লেখা আছে। একাদশীর ব্রত পালনের গুরুত্ব আর কী তার মাহাত্ম্য, সেসব পুণ্যকর্মের কথা এই যুগের মানুষ মূঢ়তাবশে ভুলে বসে আছে। যে একাদশীর ব্রত পালন করে তার মৃত্যুভয় থাকে না। এর দ্বারা আমাদের সবরকম মঙ্গল হয়। শাস্ত্র-পুরাণে এসব কথা পরিষ্কার করে লেখা আছে, কাজেই এ কোনো কল্পনার জিনিস

নয়। একথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

আমার সঙ্গে একবার দুজন মুসলমান ভদ্রলোকের দেখা হয়েছিল, যাঁরা বিধর্মী হয়েও প্রত্যেক একাদশীর দিন উপবাস করতেন।

পূজ্যপাদ আচার্যদেবের মুখে এই কথা শুনে সেখানে যারা উপস্থিত ছিল, তারা ওই মুসলমান ভদ্রলোকদের একাদশী-ব্রত পালন করা সম্বন্ধে জানবার জন্যে আচার্যদেবের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করল। তখন আচার্যদেব উক্ত ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করতে লাগলেন। আচার্যদেব বললেন, 'একবার আমরা হিন্দুধর্ম প্রচার করতে করতে রাজস্থান গিয়ে পৌঁছেছিলাম। সেখানে আমরা এক বাগানে আস্তানা নিয়েছিলাম। সেইদিন দৈবাৎ পবিত্র একাদশীর তিথি ছিল। অনেক ভক্ত আমাদের সঙ্গে সেখানে দেখা করতে এসেছিল। তাদের মধ্যে দুজন মুসলমান ভদ্রলোকও ছিলেন, যাঁরা দূর থেকে আমাকে নমস্কার করে একধারে বসেছিলেন। আমাদের মধ্যে এক ব্রহ্মচারী উপহার পাঠানো কিছু ফল প্রসাদস্বরূপ সকলের হাতে হাতে বিলি করতে আরম্ভ করলে আমি ওই ব্রহ্মচারীকে বললাম যে, 'ভাই ! কিছু প্রসাদ সামনে বসা ওই মুসলমান ভাইদেরকেও দিয়ে এস।' সেইমতো ব্রহ্মচারী ওই মুসলমান ভাই দুটিকে প্রসাদ দেবার জন্যে এগিয়ে যেতেই তাঁরা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে হাত জোড় করে বললেন, 'মহারাজ ! আজ আমাদের একাদশীর দিন, আমরা দুজনেই আজ একাদশীর নির্জলা উপবাস করে আছি। এজন্যে আমরা কিছুই গ্রহণ করব না।' ওই মুসলমান ভাইদের মুখে একাদশীর দিন নির্জলা-ব্রত করার কথা শুনে সকলেই অবাক হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘটনা জানবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে মুসলমান ভাইদের ধরে বসল যে, একাদশীর ব্রত করার তাঁদের প্রয়োজনই বা কী আর মুসলমান হয়ে তারা এসব করেনই বা কেন ? তখন আমি ওই মুসলমান ভদ্রলোক দুজনকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'ভাই ! আপনারা দুজনই তো মুসলমান, তাহলে আপনাদের একাদশীর নির্জলা উপবাস করার কারণ কী ? আর উদ্দেশ্যই বা কী ? একাদশী তো কেবল হিন্দুরা পালন করে ; আপনারা আবার কবে থেকে এই ব্রত কিসের

জন্যে করেন ? সব কথা খুলে বলুন।'

উত্তরে তাঁরা নিজেদের জীবনের এক অতি আশ্চর্যজনক সত্য ঘটনার কথা বলতে লাগলেন। তাঁরা বললেন যে, তাঁদের অনিচ্ছাকৃতভাবে একাদশীর দিন এক নকল ব্রত পালন করার ফলে কী ধরনের পরলোকের যমযন্ত্রণা থেকে নিস্তারলাভ হয়েছিল।

তাঁরা বলেছিলেন, 'আমরা জাতিতে মুসলমান। পেশায় গাড়িচালক। গাড়ি চালিয়ে মালপত্র একস্থান থেকে আর একস্থানে পৌঁছে দিয়ে সংসার চালাই। একদিন আমাদের ভাড়ায় গাড়ি নিয়ে অনেকদূর যেতে হয়েছিল। একনাগাড়ে গাড়ি চালানোর দরুন আমরা ওই দিন অন্নজল কিছুই খেতে সময় পাইনি। এইভাবে সেইদিন আমরা দুজন সারাদিন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত রয়ে গেলাম এবং বহুদূরে বিশ্রাম নেবার জন্যে একটা বাগানের পাশে গাড়ি থামালাম। খাবারদাবার সঙ্গে কিছু নেই, তাই খিদে ও তেষ্টাতে ক্লান্ত হয়ে ওই বাগানে একটা বড়গাছের নীচে শুয়ে পড়লাম। অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্যে আর খিদেয় আমরা সেখানে ঘুমিয়ে গেলাম। সেদিন ওই বাগানে আরও তিনজন অন্যলোকও এসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। তারা খাবার তৈরি করে নিজেরা খাচ্ছিল। রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে স্বপ্ন দেখলাম আমরা মরে গেছি। ভয়ংকর চেহারার কতকগুলো যমদূত আমাদের কাছে এসে আমাদের পাঁচজনকেই ধরে যমপুরীতে নিয়ে গেল। সেখানে আমরা দেখলাম একটা সুন্দর সিংহাসনের উপরে সূর্যের মতো উজ্জ্বল তেজস্বী এক মহাপুরুষ বসে আছেন। আমাদেরকে যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সেই যমদূতদেরকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা এই দুজনকে এখানে নিয়ে এলে কেন ? এরা দুজন তো আজ একাদশীর নির্জলা উপবাস-ব্রত করেছে। এদের যত তাড়াতাড়ি পার এখান থেকে নিয়ে যাও, আর যেখান থেকে এদের ধরে এনেছিলে ঠিক সেইখানে পৌঁছে দিয়ে এসো। একাদশী-ব্রতের পুণ্যের জন্যে এদের আয়ু আরও কিছুদিন বেড়ে গেছে।' আর এই কথা বলার পর যমদূতেরা আমাদের দুজনকে সঙ্গে সঙ্গে ওই বাগানে আবার রেখে দিয়ে গেল। যখন আমরা সশরীরে ফিরে এলাম আর আমাদের চেতনা ফিরে

এল, তখন আমরা যে পরলোকে গিয়েছিলাম সেই ঘটনা নিয়ে পরস্পরে আলোচনা করতে লাগলাম। সমস্ত বিষয়টা আমাদের প্রত্যক্ষ বলে মনে হল আর খুবই আশ্চর্য লাগল। প্রত্যেকটি ঘটনা হুবহু মনে পড়ল আর নির্জলা একাদশী-ব্রত কথাটা বেশ ভালোভাবে মনে ছিল, যে কথা আমরা প্রসঙ্গক্রমে এক হিন্দুভাই-এর কাছে কখনো কখনো শুনেছিলাম, কিন্তু বিশেষভাবে এ সম্বন্ধে চিন্তা করিনি। এর আগে আমাদের জীবনে কখনো একাদশী-ব্রতের কথা চিন্তা তো করিইনি এবং ও সম্বন্ধে কিছু জানতামও না। আমরা অবাক হলাম এজন্যে যে আমরা মুসলমান অথচ তিনি আমাদেরকে একাদশী ব্রতধারী কী করে বললেন ? আর অনিচ্ছাকৃত এই উপবাসকে কী করে ব্রত বলে মেনে নিলেন ? সমস্ত বিষয়টা ভালোভাবে জানার জন্যে গাঁয়ে এসে সবার আগে একজন হিন্দু পণ্ডিতের খোঁজ করলাম। তাঁর কাছে গিয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'পণ্ডিতমহাশয় ! কাল আপনাদের কোনো তিথির পালন ছিল কি ?' উত্তরে পণ্ডিতমহাশয় বললেন, 'কাল ভীম একাদশীর পুণ্য ব্রতের দিন ছিল।' পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে এই কথা শুনে আমরা যারপরনাই আশ্চর্য হয়ে গেলাম, আর আমাদের পুরো ঘটনাটা তাঁকে বললাম, তা শুনে উনি বললেন, এমন হতে পারে। একাদশীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আরও অনেক কথা এবং হিন্দুশাস্ত্রের অনেক তত্ত্বকথা তিনি আমাদেরকে আনন্দের সঙ্গে শোনালেন।

হিন্দুদের একাদশী-ব্রতের এরকম মাহাত্ম্যর কথা শুনে আমাদের সেদিন থেকেই ব্রত পালনের উপর খুব শ্রদ্ধা হল। যখন অনিচ্ছাকৃতভাবে, না জেনে, না সংকল্প করে একাদশীর দিন না খেয়ে থেকে আমাদের ব্রত পালনের এত বড় ফল লাভ হল আর নকল একাদশী ব্রত করেও আমাদেরকে একাদশীর ব্রতধারী বিবেচনা করে যমযন্ত্রণা এবং মৃত্যু থেকে রেহাই দেওয়া হল তাহলে বাস্তবে প্রত্যেকটি একাদশী পালন করলে না জানি আমাদের কত পুণ্যই না হবে ? এই চিন্তা করে সেদিন থেকেই আমরা দুজনই প্রত্যেকটি একাদশীর ব্রত পালন করতে আরম্ভ করেছি। আর সারাদিন উপবাস করে থাকি।

একাদশীর দিন আমরা অন্নজল একদম খাই না। মুসলমান হয়েও আমরা এই ব্রত পালন করছি, আর সেদিন থেকে মাছ, মাংস, ডিম, মুরগি ইত্যাদি অখাদ্য খাবার খাওয়া চিরদিনের মতো পরিত্যাগ করেছি। এখন আমাদের এই বিশ্বাস হয়েছে যে সাত্ত্বিক এবং সদাচারী পবিত্র ধর্মশীল সহজ জীবনযাপন করতে হবে।

মুসলমান ভাই দুটির মুখে একাদশী-ব্রতের মাহাত্ম্য শুনে সকলে আশ্চর্য হল।

পূজ্যপাদ আচার্যদেবের বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের শাস্ত্র-পুরাণের অদ্ভুত মাহাত্ম্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করার এ এক চমৎকার ঘটনা, যা সত্য সনাতন হিন্দুধর্মকে আরও উঁচুতে তুলে দিয়েছে। আমাদের হিন্দুধর্মের চমৎকারিত্বের কাছে সময় সময় অন্য ধর্মাবলম্বীরাও মাথা নিচু করতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত সত্য তথা কল্যাণকারক। যদি আমরা নিজেদের শাস্ত্র অনুযায়ী জীবনকে গঠন করে নিতে না পারি, তাহলে আমাদের ইহলোক এবং পরলোকের পথ কোনোদিনই পরিষ্কার হবে না এবং নিজের, নিজের ধর্ম, সমাজ তথা দেশের পরিবর্তন বা কল্যাণ ভবিষ্যতে কোনোদিন করা যাবে না।

——— ০ ———

ধর্মপ্রাণ বালক মুরলীমনোহর

শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত মুরলীমনোহর কান্দাহারের ছেলে। তার দাদু, বাবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ থেকে সেখানে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। মুরলীমনোহরের জন্ম ক্ষত্রিয় কাপুর বংশে। মুরলীমনোহর ছিল শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। সে বাল্যকালেই গীতার সমস্ত শ্লোকগুলো কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিল। প্রত্যেকদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে শৌচকর্মাদি সেরে স্নান করত, তারপর তার প্রথম কাজ ছিল গীতার একটি অধ্যায় মনোযোগ দিয়ে পাঠ করা। তার আত্মা এবং শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু যেন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ দিয়ে গড়া।

মুরলীমনোহর প্রতিদিনের মতো সেদিনও নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল ; আর ওই সময় কয়েকজন পাঠান মুসলমান ছেলেও স্নান করছিল। মুরলীমনোহর সঙ্গে করে শ্রীকৃষ্ণের ছোট্ট একটি পাথরের মূর্তি, মালা, গীতা, আসন আর ধুতি এনেছিল। সেগুলি নদীর পাড়ে রেখে এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে তার ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে ডুব দিয়ে উঠে সূর্যের দিকে মুখ করে এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে মন্ত্রজপ করছিল। বদমাইশ পাঠান ছেলেগুলো তাকে হেনস্তা করার জন্যে তার দিকে জল ছুঁড়তে আরম্ভ করে। ও বেচারা চুপচাপ শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করতে থাকল। পাঠানরা যখন দেখল এ তো কোনো প্রতিবাদ করছে না, চুপচাপ রয়েছে তখন ওরা আরও বেশি করে জল ছিটোতে লাগল, যার ফলে জপ করা একরকম কঠিন হয়ে দাঁড়াল। শেষে যখন আর থাকা গেল না, তখন মুরলী তাদের এরকম করতে নিষেধ করল। কিন্তু ওরা তো জপ ভঙ্গ করার উদ্দেশ্য নিয়েই এসব করছিল। কথায় কথায় ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গেল, আর তা বাড়তে বাড়তে গালাগালির পর্যায়ে পৌঁছল। পাঠানরা মুরলীর মা, বাবা তুলে গালি দিতে শুরু করল। তাতেও মুরলীমনোহর নরম হয়েই তাদের কথার জবাব দিচ্ছিল। শেষে পাঠানরা হিন্দুদের দেবদেবীদেরও গালাগালি

করতে আরম্ভ করল, আর মুরলীর মুখে থুতু ছিটিয়ে দিতে লাগল। তাতেও যখন মুরলীমনোহরকে তারা উত্তেজিত করতে পারল না, তখন তারা জোরে জোরে চিৎকার করে তার পূজ্য প্রাতঃস্মরণীয় ইষ্টদেবকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগল। মুরলী আর সহ্য করতে পারল না। সে একজন কট্টর সনাতনধর্মী, গীতা পাঠ করা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত ভক্ত। সে আর সহ্য করতে না পেরে সমানতালে ওদের কথার জবাব দিতে লাগল। ওদের যে দল ভারী এ কথা সে ভুলে গেল। মুসলমানরা যখন বুঝল এই কাফেরকে সোজায় জব্দ করা যাবে না তখন ওরা উঠে চলে গেল কিন্তু পরের দিন ভীষণ এক প্রতিহিংসার ষড়যন্ত্র করল। সেদিন মুরলীমনোহর ঘাট থেকে স্নান করে ফিরে আসার পর ঘরে সেইমাত্র ঢুকেছে, তখনও তার কাপড় বদলানো হয়নি, ইত্যবসরে তার ঘরের চারপাশ আফগানি পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলা হল। তাকে জোর করে ঘর থেকে বার করে এনে বেঁধে কান্দাহারের গভর্নরের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করা হল। তার নামে নালিশ দেওয়া হয়েছিল, সে মুসলমানদের পীরকে গালাগালি করেছে এই বলে। কাছারির বাইরে তখন হাজার হাজার পাঠান মুসলমান চিৎকার চেঁচামেচি করে দাবি করছে মুরলীমনোহরের এখনই শিরচ্ছেদ করা হোক। মুরলীমনোহরের বিচারের জন্যে আদালত বসল। বাদীপক্ষের সাক্ষীরা বলল মুরলীমনোহর মুসলমানদের পীরকে অপমান করেছে—তারা শুনেছে। মুরলীর পক্ষের সাক্ষীরা বলল, না, মুসলমান পাঠানরা যে সব কথা ওকে বলেছিল সেই কথাগুলোই সে ঘুরিয়ে তাদেরকে বলেছে। তখন বাদীপক্ষের উকিল সওয়াল করতে লাগল, 'ঠিক আছে! মুরলী হিন্দু হয়ে তাদের আল্লাহ্‌কে অপমান করার সাহস কোথা থেকে পেল ? তার এই ধরনের অপরাধ কোনোক্রমেই মাফ করা যায় না। তাকে জীবিত রেখে কোনোক্রমেই ছেড়ে দেওয়া যায় না।' হাকিম মুরলীর সুন্দর লাল টুকটুকে মুখের দিকে একবার তাকালেন। তাঁর মনের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্বের ঝড় উঠল। পরিস্থিতি বলছে, ওকে সত্বর ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হোক, কিন্তু ন্যায় বলছে ওকে বাঁচাতেই হবে, ওর কোনো অপরাধ নেই।

মুরলীর বাবা, বাড়ির লোকজন সকলে আদালতে দাঁড়িয়ে ছিল আর

ওদিকে ঘরে তার মা ইষ্টদেবের সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা করছিল যে, তার ছেলে যেন ভালোভাবে ঘরে ফিরে আসে। মুরলী আসামীর কাঠগড়ায় নির্ভীক বীরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। আদালতের ভিতর লোকে লোকারণ্য। হাকিম চিন্তা করলেন কী করে একে ফাঁসি থেকে বাঁচানো যায়। একে ফাঁসি থেকে যেমন বাঁচাতে হবে তেমনি ওদিকে মোল্লা-মৌলবীরাও যেন হৈ চৈ করতে না পারে তাও দেখতে হবে। তিনি বললেন, 'মুরলীমনোহর ! তুমি যে অপরাধ করেছ তা কোনোরকম ক্ষমার যোগ্য নয়। তুমি আল্লাহ্-তালার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে যে পাপ করেছ তা কোনোরকমেই ক্ষমা করা যেতে পারে না। তবে যদি তুমি আল্লাহ্-তালার কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নাও, আর দীন-ইসলামের আশ্রয় স্বীকার কর তো তোমাকে ক্ষমা করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে তোমাকে সরকারের কোনো এক উঁচু পদে নিযুক্ত করা যেতে পারে আর তোমার বিয়ের ব্যবস্থাও হতে পারে, যাতে করে তুমি আরামে জীবন কাটাতে পারবে।'

হাকিমের কথা শুনে সকলের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি গিয়ে পড়ল মুরলী-মনোহরের মুখের উপর। কিন্তু বীর মুরলীমনোহর এতটুকু খুশি হল না। তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল, সে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল। হাকিম তাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ! ইচ্ছা আছে ? রাজি তো ?'

মুরলীমনোহর হেসে উত্তর দিল, 'হুজুর ! আমি হিন্দু, সনাতনধর্মী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিত্য পাঠক, শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। আমি কী করে মুসলমান হতে পারি ? যে কৃষ্ণের মনোহর রূপ আমার হৃদয় ভরে রেখেছে সেখান থেকে তাকে কী করে সরাই।'

হাকিম—'শোনো, মূর্খ ছেলে ! কী মিথ্যা ধারণা নিয়ে পড়ে আছ ? ইসলাম ধর্ম স্বীকার করলে প্রাণ বাঁচবে আর জীবন থাকলে সুখ এবং স্বর্গ দুই-ই পাবে।'

মুরলী—'আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুধর্ম ত্যাগ করতে পারব না। আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। মৃত্যু তো একদিন হবেই তাহলে আমি আমার ধর্ম

ত্যাগ করে আমার পরলোক কেন নষ্ট করব ?'

হাকিম—'তুমি ভুল করছ। আচ্ছা ঠিক আছে ! আজ তোমাকে সময় দিচ্ছি, ভালো করে চিন্তাভাবনা কর। মনে হচ্ছে শয়তানে তোমাকে ভর করেছে। তোমার চোখে শয়তানের ছায়া পড়েছে! এখন তোমার মৃত্যু ছাড়া আর কোনো শাস্তিই দেখা যাচ্ছে না। আজ সারারাত তুমি চিন্তাভাবনা করো, আর কাল এসে বলবে, কী চাও—মৃত্যু না ইসলাম।'

আদালত সেদিনের মতো বন্ধ হল, আর মুরলীমনোহরকে হাতকড়া লাগিয়ে কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়া হল। সে রাত্রে কিছু খাওয়াদাওয়া করল না, সারা রাত গীতা পাঠ করতে লাগল। গীতার শ্লোকগুলো সুর করে আবৃত্তি করতে করতে একেবারে তন্ময় হয়ে গেল, মনে হল যেন সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সামনে দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলে উপদেশ দিচ্ছেন আর সে ভক্তিভরে তাঁর চরণে মাথা নুইয়ে প্রার্থনা করছে—'প্রভু ! শক্তি দাও, হৃদয়ে বল দাও। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি আর হিন্দুধর্মের সম্মান রক্ষা করতে হাসতে হাসতে ফাঁসিতে ঝোলার সাহস দাও।'

সকাল হল। মুরলী প্রাতঃক্রিয়া শেষ করে স্নান করল আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে বসে তদ্গত চিত্ত হয়ে পড়ল। এর মধ্যে তার মা-বাবা-ভাই-বোন সব জেলের দরজায় এসে হাজির হল। সবাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ; কিন্তু আশ্চর্য যে মুরলীমনোহরের মুখে এতটুকু দুঃখের ছাপ দেখা গেল না। মা বলল, 'বাবা ! তুই বিচারকের কথা মেনে নে, তুই বেঁচে থাকলে আমি অন্তত চোখে দেখতে পাব। আমার হৃদয়ের টুকরো তুই, তোকে জীবিত দেখতে পেলেই আমার হৃদয় ঠাণ্ডা হবে।' মুরলী বলল, 'মা ! তোমার আমার প্রতি মায়া-মমতা এ কথা বলতে বাধ্য করছে। যদি আমার এই অন্তিম সময়ে তোমার ওই কথা বলতে ভালো লাগে তবে হিন্দুধর্মের ওই অমৃত আমাকে কেন খাইয়েছিলে ? কেন আমার হৃদয়ে ধর্মের আলো জ্বেলেছিলে ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করতে কেন শিখিয়েছিলে ? আমাকে সংসারের ভোগের প্রতি লালসাহীন কেন

করেছ ? তাহলে তো আজ সংসারের মিথ্যা ভোগের জন্যে ধর্ম, কর্ম, ভক্তি, বিশ্বাস, মা, বাবা, ভাই, বোন সবই বিসর্জন দিতে পারতাম। এখন তো আমার হৃদয়ে গীতার বাণী আর ভগবানের শ্রীমূর্তি সদা বিরাজমান। সংসারের সব কিছু এখানেই থেকে যাবে, কিন্তু পরলোকে ধর্ম আমার সঙ্গে যাবে। তাহলে ধর্মকে আমি কেমন করে ত্যাগ করব ? আমাকে আর দুর্গন্ধময় নরকে ছুঁড়ে দিয়ো না। প্রসন্নচিত্তে হাসতে হাসতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে করতে ধর্মরক্ষার জন্যে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে দাও। কাজী আমার শরীরটা কাটবে, কিন্তু মা তুমি আমার আত্মাটাকে কেটো না।'

যখন জেলের অফিসার বুঝল যে মুরলীমনোহর মুসলমান হতে কোনোক্রমেই রাজি নয় তখন সে হাকিমকে খবর দিল—'হুজুর ! কয়েদীকে জিজ্ঞাসা করা হল, আজ রাত্রে তুমি কী সাব্যস্ত করলে—মৃত্যু না ইসলাম ? তো সে নির্ভয়ে জবাব দিল, হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা মনে আসাও মহাপাপ, মহামূর্খতা। সে নিজের সিদ্ধান্তেই অটল।'

হাকিম কোর্টে এসে বিচারের আসনে বসলেন আর হুকুম দিলেন আজই দুপুরে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক।

ফাঁসির ময়দানে হাজার হাজার লোক জমায়েত হল। পাঠানদের বড় শখ আজ নিজের চোখে কাফেরের মৃত্যুদণ্ড দেখবে। কট্টর সনাতনধর্মী বীর বালক মুরলীমনোহরকে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড় করানো হয়েছিল। হাকিম হুকুম দিলেন, 'মাথা উঁচু করো।' মুরলী হুকুম মতো মাথা উঁচু করল। হাকিম ফের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি প্রস্তুত ?' মুরলী জোর গলায় বীরের মতো জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমি আমার ধর্মরক্ষার জন্যে মরতেও প্রস্তুত।' বন্দুকের তিনটি গুলি তার বুক চিরে বেরিয়ে গেল। হিংস্র পাঠানেরা পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে তার দেহটা ছিন্নভিন্ন করে দিল। আজ এক বীরত্বব্যঞ্জক আন্তরিকতার নিদর্শন সকলের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। শ্রীকৃষ্ণভক্ত মুরলীমনোহর ধর্মরক্ষার জন্য হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করে হিন্দু বালকদের কাছে ধর্মের জন্য আত্মত্যাগের এক শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে রইল।

— o —

ইচ্ছামৃত্যু

মৃত্যু-বিজয়িনী ভক্তিমতী দেবী শ্রীভিরাওয়া বাঈ

(আসন্ন মৃত্যুকে এক মাস আট দিন দূরে ঠেকিয়ে রেখে যথাসময়ে পদ্মাসনে বসে ভগবানের নাম স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগের এক বিরল উদাহরণ)

১৯৬৮ সালের জুলাই মাস। একদিন প্রখ্যাত স্বভাবকবি ব্রহ্মর্ষি কৃষ্ণানন্দ মহারাজ কৃপা করে পিলখুবায় এসেছিলেন এবং তাঁর মহত্বপূর্ণ উপদেশ দান করেছিলেন। একদিন সৎসঙ্গে আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি দেবী ভিরাওয়াঁ বাঈ-এর 'ইচ্ছামৃত্যু' সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। তারই সারাংশ সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করছি :

পরম পূজ্যা মাতা শ্রীভিরাওয়াঁ বাঈ-এর জন্ম মুলতান শহরের (বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত) সারস্বত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীপ্রভুদয়াল শর্মার ধর্মপত্নীর গর্ভে। বয়ঃকালে যথাসময়ে পণ্ডিত হরনারায়ণ ঝীংগরন মহারাজের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পণ্ডিত হরনারায়ণ অত্যন্ত সরল, সৌম্য, সদাচারী, সাত্বিক মানুষ ছিলেন। তিনি অতি সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। তিনি সরকারি চাকরি করতেন। ভিরাওয়াঁ বাঈও অতিশয় পতিব্রতা, সদাচারিণী এবং ধর্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। ঈশ্বরের কৃপায় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একসঙ্গে সাধনভজন, ব্রত-উপবাস, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি নিয়ে থাকতেন।

সেই সময় পাঞ্জাবের প্রখাত যোগীরাজ পূজনীয় স্বামী সীতারামজী মুলতানে আসেন। তাঁর সৎসঙ্গেও ভিরাওয়াঁ বাঈ তাঁর স্বামীর সঙ্গে যাতায়াত করতেন। স্বামীজীর সৎসঙ্গে এই দম্পতি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। আর তাঁদের অনুরোধে স্বামীজী উভয়কেই যোগ সাধনার দীক্ষা দান করেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্য সেরে আপন ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের পূজা সেরে যোগসাধনায় বসতেন, আর

সমাধির আনন্দ ভোগ করতেন। মাতাজী সাধনকালে এতটুকু শরীরের চিন্তা করতেন না। চার-পাঁচদিন পর্যন্ত নিরাহারে থেকে যেতেন। চান্দ্রায়ণ-ব্রত এবং উপবাসাদি দ্বারা নিজের শরীরকে সূক্ষ্মশরীরে পরিবর্তন করার জন্যে নিরন্তর চেষ্টা করতেন।

যোগাভ্যাসের সময় তাঁর ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সর্বদা তাঁর সামনে থাকত। তিনি ভক্তিভরে শ্রীবিগ্রহের পূজা-আরতি শেষ করে, নাম-সংকীর্তনে মেতে উঠতেন এবং কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে পড়তেন। যোগাভ্যাস তথা কৃষ্ণ আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী সেবাতেও তিনি ছিলেন তৎপর। স্বামীর সেবা-শুশ্রষা তিনি খুব মনোযোগ সহকারে করতেন। মাতাজীর আহার ছিল সাত্ত্বিক। রসুন পিঁয়াজ শালগম ইত্যাদি তিনি ছুঁতেন না। আচার এবং ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে তিনি খুব সতর্ক ছিলেন। কুয়ো থেকে জল নিজে তুলে আনতেন। নিজের হাতে রান্না করতেন এবং নিজের ইষ্টদেবকে ভোগ নিবেদন করে, স্বামীকে ভোজন করিয়ে, তবে নিজে প্রসাদ নিতেন। তিনি জীবনে কোনোদিন টিউবওয়েলের জল খাননি। ট্রেন যাত্রার সময় নির্জলা উপবাস দিতেন, আর যাত্রা শেষে বাড়িতে এসে ডুব দিয়ে স্নান করতেন। বিদেশি ওষুধ কোনোদিন খেতেন না।

তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণানন্দ কথা ও কীর্তন দ্বারা সনাতন ধর্ম প্রচার করতেন। মাতাজী তাঁর কাছ থেকে কিছু নিতেন না। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রমণি রেলে চাকরি করতেন। তিনি নিয়মিত গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতেন, বিনা জপে তাঁরা অন্নগ্রহণ করতেন না। ঘুষকে পাপ মনে করতেন। তিনি পবিত্র বিশ্বাস এবং সৎপরিশ্রম দ্বারা উপার্জন করতেন বলে মাতাজী তাঁর খরচ নির্বাহের জন্যে তাঁর কাছ থেকে মাত্র পাঁচ টাকা করে প্রতিমাসে নিতেন। একবার চন্দ্রমণি পাঁচিশ টাকা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু মাতাজী তা ফেরৎ দিয়ে বলেছিলেন, 'আমাকে মাসে পাঁচ টাকা দিলেই আমার খরচ চলে যাবে।'

মাতাজী তাঁর নিজের বাড়িতে পাড়াপড়শি মেয়েদের নিয়ে ভগবানের নামকীর্তন এবং সৎসঙ্গ করতেন। তিনি বিধবা মা-বোনদের ত্যাগী এবং

তপস্বিনীর জীবন কাটানোর উপদেশ দিতেন এবং নিরন্তর সৎপ্রেরণা দান করতেন। তিনি সৎসঙ্গে মা-বোনদের বলতেন, 'নরক যন্ত্রণা ও যমদূতের হাত থেকে যারা বাঁচতে চায় এবং ইহলোক ও পরলোক সফল তথা সার্থক করতে চায় তাদের ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিতে এক অদ্ভুত আনন্দ আছে।' কথা, কীর্তন, সৎসঙ্গ, রামচরিতমানস পাঠ ইত্যাদির দ্বারা সনাতন ধর্মের প্রচার নিয়ে তিনি সর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন।

তাঁর স্বামী পণ্ডিত হরনারায়ণ একদিন ভগবৎ কথা শুনতে শুনতে দেহত্যাগ করেন। মাতাজী গভীর দুঃখ পেলেন। কিন্তু তখন থেকেই সংসারের উপর তাঁর অনাসক্তি দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল আর তাঁর সাধন-ভজনও তখন থেকেই আরও তীব্র হতে লাগল। ফলস্বরূপ যোগের দ্বারা মাতাজী তাঁর মৃত্যুর দিনক্ষণ জেনে যান, আর সকলকে সে কথা জানিয়ে দেন। মাতাজীর ভক্ত-শিষ্যরা এই খবর শুনে খুবই দুঃখ পেলেন, কিন্তু কী করা যাবে, কিছুই করার ছিল না, তাই সকল আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের চিঠি দিয়ে সে কথা জানিয়ে দেওয়া হল।

যেদিন মা দেহত্যাগ করবেন সেদিন প্রচুর লোকের সমাগম হল। শ্রীমায়ের পুত্রেরা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, সৎসঙ্গী, পরিচিত ব্যক্তিরা তাঁর পরমধামে গমনের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখবার জন্যে সেখানে উপস্থিত হলেন। পবিত্র গোবর দিয়ে ঘরের সমস্ত জায়গা লেপা হয়েছিল। কুশের আসন বিছিয়ে দিয়ে তার সামনে শ্রীকৃষ্ণের ছবি টাঙিয়ে দেওয়া হল। খোল, কর্তাল বাজিয়ে ভগবানের নামকীর্তন শুরু হল।

বেলা চারটের সময় মাতাজীর সংসার ত্যাগের নির্দিষ্ট সময়। তিনি স্নানাদি সেরে শুদ্ধ কাপড় পরে নিয়মমাফিক শ্রীকৃষ্ণের পূজা এবং প্রার্থনা করে গঙ্গাজল তুলসীপাতা সমেত ভগবানের চরণামৃত মুখে দিয়ে আসনে বসলেন। দেহত্যাগের আগে তিনি প্রাণায়ামে মনকে স্থির করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন সময় তাঁর ভাইপো পণ্ডিত যুগলকিশোর জয়তিলকের ছেলে কবিরাজ দেবেন্দ্র শর্মা ষট্‌শাস্ত্রী ভিড় ঠেলতে ঠেলতে

এসে মাতাজীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। ষট্‌শাস্ত্রী নিবেদন করলেন, 'মা! আপনি প্রেম, ভক্তি এবং বৈরাগ্যের জীবন্ত মূর্তি, সনাতন ধর্মের প্রচারকর্ত্রী কিন্তু এ রকম ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ কেন করছেন?'

মাতাজী—'বাবা! ধর্মবিরুদ্ধ কাজ কী রকম?'

ষট্‌শাস্ত্রী—'আপনি পরম যোগিনী হয়ে দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করতে যাচ্ছেন? এ তো শাস্ত্রসম্মত নয়, আপনি উত্তরায়ণে যাত্রা করুন।'

মাতাজী—'তোমার কথা অবশ্য ঠিকই বাবা! কিন্তু আজ আমাকে যেতে দাও। এখন আর আমি নিজের হাতে জল ইত্যাদি আনতে পারি না, কষ্ট হয়, শরীর আর চলছে না।'

ষট্‌শাস্ত্রী—'উত্তরায়ণ আসতে তো মাত্র এক মাস আট দিন বাকি। এই কটা দিন জল আনা ইত্যাদি সেবার সব কাজ আমি নিজে করে দেব। এই কটা দিন আপনি দয়া করে আমাদেরকে আপনার সৎসঙ্গ এবং মূল্যবান উপদেশ থেকে বঞ্চিত করবেন না।'

মাতাজী—'আচ্ছা ঠিক আছে, সকলের জন্য আমি তাহলে এক মাস আট দিন পরেই যাব।'

যখন মাতাজী এই কদিনের জন্যে মৃত্যুকে বিদায় দিলেন তখন সকলে মাতাজীর জয়ধ্বনি করতে করতে বাড়ি ফিরে গেল।

অনাসক্ত চিত্ত, ভগবানের প্রতি ভক্তি, গোমাতার সেবা আর সাধনার বলে মাতাজী আসন্ন মৃত্যুকে ফিরিয়ে দিলেন কিন্তু তাঁর কথামতো দেখা গেল তাঁর শরীর খুবই দুর্বল আর শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। শ্রীদেবেন্দ্র শর্মা আর মায়ের বড় মেয়ে কুশাবাঈ তাঁর কাছে সর্বক্ষণ থেকে কুঁয়ো থেকে জল আনা থেকে শুরু করে সেবার সমস্ত কাজ করতে লাগলেন।

দেহত্যাগের চার-পাঁচ দিন আগে গাঁয়ের এক ভদ্রলোক এলেন। মাতাজীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণানন্দজীকে তিনি অনুরোধ করলেন যে, তাদের গোশালার উৎসবে তাকে ভাষণ দিতে হবে। আর যেদিন মাতাজী দেহত্যাগ করবেন ঠিক সেই দিনই গোশালার উৎসব। শ্রীকৃষ্ণানন্দ দোটানায় পড়ে গেলেন। 'হ্যাঁ', 'না' কিছুই বলতে পারলেন না। ভদ্রলোক তখন

মাতাজীর কাছে গিয়ে বললেন, 'মা, যেদিন আপনি চিরদিনের জন্যে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন ঠিক সেদিনই গোশালার উৎসব। আপনার ছেলে ওইদিন ভাষণ না দিলে গোশালার হাজার টাকা আয় নষ্ট হয়ে যাবে, ফলে গোরুগুলো না খেয়ে মরবে।'

মাতাজী পুত্রকে কাছে ডেকে বললেন, 'বাবা! তোমাকে অবশ্যই ভাষণ দিতে যেতে হবে। গোমাতা না খেয়ে মরবে এ বড় পাপ। তুমি আমার চিন্তা না করে উৎসবে নিশ্চয় যাবে।'

মাতাজীর আজ্ঞানুসারে কৃষ্ণানন্দজী ওই উৎসবে ভাষণ দিতে চলে গেলেন।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে মাতাজী স্নান, পূজা সেরে শুদ্ধ কাপড় পরে গঙ্গাজল এবং তুলসীপাতা মুখে নিয়ে আর গোবর লেপা উঠানে বিছানো কুশাসনে বসে উপস্থিত ভক্তদের দ্বারা নামকীর্তন শুনতে শুনতে এবং ভগবানের নাম জপ করতে করতে দেহত্যাগ করলেন। সমস্ত লোক মায়ের জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

প্রাতঃস্মরণীয়া মা ভিরাওয়াঁ দেবীর শবাধার মিছিল করে বার করা হল। ভগবানের নাম-সংকীর্তন হচ্ছিল, শবাধারে (বাঁশের মাচা) ফুল এবং ফুলের মালা দেওয়া হচ্ছিল। মাতাজীর জয়ধ্বনি দিয়ে ভক্তবৃন্দ তাঁর মরদেহ কাঁধে নিয়ে অগ্নিসংকারের জন্যে ধীরে ধীরে শ্মশানের দিকে যেতে লাগল।

এই ঘটনা বেশিদিন আগেকার নয়, প্রায় ১৯৪৫ সালে চোখে দেখা এক বাস্তব ঘটনা।

—— ০ ——

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এক খ্রিস্টান পাদ্রীর রোগ নিরাময় এবং সনাতন ধর্ম গ্রহণ

১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস, যেদিন আমি পিলখুবা সনাতন ধর্মসভার বাৎসরিক উৎসবে যোগদানের আর্জি নিয়ে দিল্লীর ভূপেন্দ্র ভবনে পৌঁছলাম, সেদিন সেখানে আমার সঙ্গে প্রসিদ্ধ সনাতনধর্মী হিন্দু নেতা 'বীর ভারত' পত্রিকার সম্পাদক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীশিবরামসেবকজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি একজন বিশিষ্ট বক্তা, বিদ্বান এবং আমার পরম বন্ধু। শ্রদ্ধেয় শিবরামসেবকজী আমাকে দেখেই বললেন, 'আচ্ছা ! রামশরণদাসজী ! আপনি এসে গেছেন ? আমি তো আজই একটা আশ্চর্যজনক সত্য ঘটনার কথা আপনাকে লিখে পাঠাব ভাবছিলাম। চলুন, আপনি যখন নিজেই এসে গেছেন, তখন আমার কাছ থেকে ঘটনাটা শুনে লিখে নেবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম পবিত্র নাম, তাঁর প্রার্থনায় কী অদ্ভুত ফল আর হিন্দু রমণীর পাতিব্রত্য ধর্মের কী মহত্ত্ব—তা এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হবে।

এক খ্রিস্টান দেশি পাদ্রী, যে আমাদের হিন্দুজাতির লোকদেরকে একধার থেকে ধর্মচ্যুত করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে বিধর্মী করে ছাড়ছিল, সে নিজেই শ্রীকৃষ্ণ নামের অদ্ভুত মহিমা দেখে আর হিন্দুর নারীর পবিত্র পাতিব্রত্য ধর্মে প্রভাবিত হয়ে খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে নিজেকে ধন্য বলে মেনে নিয়েছে। এই সত্য ঘটনাটি আজ আপনাকে বলব।'

শিবরামসেবকজী বলতে লাগলেন, "ভক্ত রামশরণদাসজী ! আমি

আসামে খ্রিস্টানদের মধ্যে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রচার সমাপ্ত করে পাঞ্জাবের স্বামী গণেশানন্দজীর সঙ্গে ফিরে আসছিলাম। ফেরার পথে আসাম সীমান্তে এসে একদিন বিশ্রাম নেবার জন্যে ওখানে থেকে গেলাম। হিন্দুধর্মের কী যে মাহাত্ম্য সে সম্বন্ধে ওখানে একটি ঘটনার কথা শুনলাম, যা শুনে যারপর-নাই আশ্চর্য এবং খুশি হলাম। ঘটনাটা হল—

আসামের পাহাড়ি অঞ্চলে তখন খ্রিস্টান ধর্মের খুব বাড়বাড়ন্ত। হিন্দুরা পবিত্র হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে দলে দলে খ্রিস্টান হচ্ছে, এই শুনে তখন হিন্দু ধর্মের সুপ্রসিদ্ধ নেতা ভারতভূষণ শ্রীমদনমোহন মালব্য খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবতে লাগলেন খ্রিস্টান কুচক্রীদের হাত থেকে হিন্দুধর্মকে কীভাবে রক্ষা করা যায়। শ্রীমালব্যজী সনাতন ধর্মের সুপ্রসিদ্ধ মহান পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রী, যিনি সেই সময় বিহার সনাতন ধর্ম প্রতিনিধি সভার মন্ত্রী, তাঁকে সেখানে পাঠালেন, যাতে তিনি ওখানে কিছুদিন অবস্থান করে খ্রিস্টান মতকে দাবিয়ে হিন্দুধর্ম প্রচার করে হিন্দুদের খ্রিস্টান হওয়া থেকে নিরত করতে পারেন।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রী সেখানে প্রায় সাত বছর থেকে বেশ সাহসের সঙ্গে আসামের পাহাড়ি অঞ্চলে হিন্দুধর্ম প্রচার করেছিলেন। তিনি এই রকম এক পরিকল্পনা করেছিলেন যে, নওগাঁয়ে একটি বিরাট বড় হিন্দু সম্মেলন করা হোক আর হিন্দু মহাসভার জাঁদরেল নেতা স্বর্গীয় মান্যবর ডাঃ বিক্রম মুঞ্জেকে (যিনি সে সময় জীবিত ছিলেন) সভাপতি করে তাঁকে দিয়ে ওই বিরাট সম্মেলন পরিচালনা করানো হোক। হিন্দুধর্মের প্রচার এবং এই সম্মেলনের খরচ নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সে কারণে লক্ষ্মীনারায়ণজী অর্থ সংগ্রহের জন্যে খুবই ছোটাছুটি আরম্ভ করলেন।

একদিন আসামের 'জয়ন্তিয়া' পাহাড়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় একটা নদী

পড়ার ফলে নৌকায় করে ওপারে যেতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়েছিল। রাত্রি প্রায় ৮টায় সেখানে পৌঁছলেন। সেখানে তাঁর কোনো পরিচিত লোক না থাকায় তিনি খুবই সমস্যায় পড়লেন। তিনি চিন্তা করছেন, আজ রাত্রে তাহলে কোথায় থাকা যায়, পাহাড়ি রাস্তাও তিনি চেনেন না। এমন সময় দেখলেন দূরে একটা দোতালা বাড়িতে আলো জ্বলছে। তিনি ভগবানের নাম করে সে দিকেই হাঁটা দিলেন। সেখানে পৌঁছে বুঝতে পারলেন ওই বাড়ি একজন জবরদস্ত খ্রিস্টান পাদ্রীর বাংলো। আর ঠিক সেই সময় পাদ্রীসাহেব তাঁর দোতলার ঘরের বারান্দায় বসেছিলেন। তিনিও দেখলেন কে যেন একজন তাঁর বাংলোর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। উপরের বারান্দা থেকে তিনি একটু চেঁচিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ? কে তুমি ?' শাস্ত্রীজী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কোনো উত্তর দিলেন না, আর তাই দেখে পাদ্রী-সাহেবের রক্ত গরম হয়ে গেল। তিনি রেগে উপর থেকে নিচে নেমে এসে ফের জোরের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কে ? কোনো কথা বলছ না কেন ?' কথাগুলো রাগের মাথায় এমনভাবে বললেন যেন শাস্ত্রীজীকে তিনি খেয়েই ফেলবেন। জবাব পাওয়া গেল, 'আমি পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রী'।

অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা এবং আরো অনেক পত্র-পত্রিকায় পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রীর ছবি এবং নাম ছাপা হয়েছিল। ছবির নিচে লেখা ছিল ভারতভূষণ শ্রীমদনমোহন মালব্য কর্তৃক তাঁকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি করে আসামের পাহাড়ি অঞ্চলে হিন্দু সংস্কৃতির প্রচারের জন্য পাঠানো হচ্ছে। পাদ্রীসাহেব ওই সকল পত্রিকায় শাস্ত্রীজীর ছবি দেখেছেন এবং তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা আগেই পড়েছেন। যখন তার কানে গেল আগন্তুকের নাম শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রী, তখন সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত রাগ জল হয়ে গেল আর তক্ষুণি মাথা থেকে টুপি খুলে একদিকে সরিয়ে রেখে

অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম জানালেন, আর ভক্তিগদগদ হয়ে তাঁকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর এবং ভালোবাসা জানালেন। তারপর হাত ধরে তাঁকে নিজের কুঠির ভিতরে নিয়ে এসে একটি চেয়ারে বসতে দিলেন, আর তাঁর জলযোগের জন্য নানারকম ফল কেটে থালায় সাজিয়ে তার সামনে ধরলেন এবং হাতজোড় করে সেগুলি খাবার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলেন।

বুদ্ধিমান পাদ্রীসাহেব বুঝতে পারলেন যে এই শাস্ত্রীজী একজন কট্টর সনাতনধর্মী ব্রাহ্মণ, আর বিরাট বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি বিধর্মীর হাতে কোনো কিছু খাবার দ্রব্য গ্রহণ করবেন না। তাই তাড়াতাড়ি শাস্ত্রীজীকে নিকটেই এক হিন্দু দেবমন্দিরে নিয়ে গেলেন। মন্দিরের পুরোহিতকে পকেট থেকে টাকা দিয়ে বললেন, 'পূজারিমহাশয় ! ইনি একজন বিদ্বান ব্যক্তি আর সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। আপনি আমার হয়ে আটা, ঘি, শাকসবজি ইত্যাদি যা লাগে কিনে এনে রান্না করে এঁর খাওয়ার এবং রাত্রে এখানেই আপনার কাছে থাকার ব্যবস্থা করে দিন। এঁর যেন কোনোরকম অসুবিধা না হয় দেখবেন।'

পূজ্যপাদ শাস্ত্রীজী ওই খ্রিস্টান পাদ্রীর তাঁর প্রতি এইরকম অদ্ভুত শ্রদ্ধা, প্রেম, ভালোবাসা এবং আদর-যত্ন দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন যে, 'আমি তো একজন কট্টর সনাতনধর্মী হিন্দু, আর এ একজন হিন্দুবিরোধী খ্রিস্টান পাদ্রী। এর তো হিন্দুকে খ্রিস্টান করাই কাজ এবং আমি এর ঠিক বিপরীত আর ঘোর বিরোধী। এদের দ্বারা ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদেরকে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনা আমার কাজ, কিন্তু তাও এ আমাকে তার ঘোর শত্রু না ভেবে আমাকে এমন অদ্ভুত ভালোবাসা দেখাচ্ছে কেন ? এর কারণ কী ?' তিনি তখন পাদ্রীসাহেবকে তাঁর প্রতি এইরকম অদ্ভুত শ্রদ্ধা-ভালোবাসার কথা জিজ্ঞাসা করলে ওই পাদ্রীসাহেব শাস্ত্রীজীকে বললেন যে, 'পণ্ডিতজী আপনি এখন ক্লান্ত হয়ে

পড়েছেন আর রাত্রিও অনেক হয়েছে, এখন আপনি খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম করুন। আমি কাল সকালে আপনার কাছে অবশ্যই আসব আর আমার জীবনের সমস্ত ঘটনার কথা আপনাকে বলব।' পাদ্রীসাহেব এই বলে নিজের কুঠিতে ফিরে গেলেন। মন্দিরের পুরোহিত পাদ্রীর দেওয়া টাকায় আটা, ঘি ইত্যাদি এনে রান্না করে শাস্ত্রীজীকে খুব যত্ন করে খাওয়ালেন। শাস্ত্রীজী সেই রাত্রি পূজারির ঘরেই রইলেন।

পাদ্রীর নিজের জীবনের ঘটনা শোনানো

সকাল হতেই পাদ্রীসাহেব লক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রীর কাছে এলেন এবং খুব ভক্তির সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর শাস্ত্রীজীকে সঙ্গে নিয়ে নিজের কুঠিতে এলেন ; আর তাঁকে একটি চেয়ারে বসিয়ে নিজে সামনে আর একটি চেয়ার নিয়ে বসলেন এবং নিজের জীবনের সত্য ঘটনা আদ্যপান্ত শোনাতে শুরু করলেন।

পাদ্রীসাহেব বললেন, ''শাস্ত্রীজী মহারাজ! আমি প্রথমে হিন্দুই ছিলাম। আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, আমার নাম ছিল দামোদর উপাধ্যায়। আমার বাবা আজমগড় জেলায় থাকতেন। খুব গরিব ছিলাম আমরা। সেজন্যে আমার বাবা রোজগারের আশায় 'জয়ন্তিয়া পাহাড়ে' চলে আসেন। সেইসময় আমার মা মারা যান। আমরা দুই ভাই ছোট ছোট। দুর্ভাগ্যক্রমে বাবাও অসুখে পড়লেন আর কিছুদিন রোগ ভোগের পর একদিন মারা গেলেন। আমাদের কাছে তখন একটা পয়সা নেই। আমরা দুইভাই-ই খুব ছোট, বুদ্ধিসুদ্ধি কম। তাই কিছু সহৃদয় লোক মিলে আমার বাবার সৎকারাদি করলেন। এরপর কী করি, কোথায় যায়! মা বাবাকে হারিয়ে দুভাই এখানে-সেখানে অনাথের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ঘোর সংকটে পড়ে গেলাম। সে সময় কেউ যদি দয়া করে খেতে দিত তো খেতাম নইলে দুভাই না খেয়ে উপোস দিয়ে দিন কাটাতাম। আমাদের তখন খুব করুণ

অবস্থা। কিছুদিন পর আমাদের এই ভিখারির দশা দেখে এক খ্রিস্টান পাদ্রী আমাদেরকে এক অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। তার কয়েকদিন পর আমার কপালে আরও এক ঘোর বিপদ এসে জুটল। আমার ছোট ভাইটাও পেটের অসুখে ভুগতে ভুগতে মারা গেল। আমি হয়ে গেলাম একা। আমি খ্রিস্টান স্কুলে পড়াশুনা করতাম কিন্তু যেহেতু হিন্দু ব্রাহ্মণ তাই খুব ভয়ে ভয়ে থাকতাম। এভাবে থেকেই বি.এ. পাস করলাম। তখনই মিশন কর্তৃপক্ষ আমাকে আমেরিকান খ্রিস্টান চার্চের পাদ্রী করে নিলেন। আমার থাকা খাওয়ারও একটা ভালো বন্দোবস্ত হল। তারপর থেকে সুখেই দিন কাটছিল কিন্তু মিশন কর্তৃপক্ষ আমার ভালো কাজের যোগ্যতা দেখে আমাকে আরো উঁচু পদে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে নিজেদের খরচে ট্রেনিং-এর জন্য আমেরিকা পাঠিয়ে দিল। আমেরিকায় থেকে আমি এম.এ. পাস করলাম সঙ্গে ডাক্তারি ডিগ্রিও পেলাম। তারপর আমাকে এই আসামের পাবর্ত্য অঞ্চলে লাট পাদরীর পদ দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল। একটি এম. এ. পাস খ্রিস্টান মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হল। আর এসময় আমি বেশ ঠাটবাটের সঙ্গেই বাস করতে লাগলাম। আমার জীবন সুখেই কাটছিল কিন্তু ভাগ্য যাবে কোথায়, আমি কিছুদিন পর টি.বি. রোগে আক্রান্ত হলাম। এই রোগ আমার এমন বেড়ে গেল যে, মুখ দিয়ে দিনরাত রক্ত উঠতে লাগল। যে স্ত্রীকে আমি এতদিন প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবেসে এসেছি, কাল পর্যন্ত আমাকে একদণ্ড না দেখে যে থাকতে পারত না সেই স্ত্রী আমাকে মরণাপন্ন দেখে আর অস্পৃশ্য ভেবে কাছে ঘেঁসা বন্ধ করে দিল। যে ঘরে আমি শুয়ে থাকতাম সেই ঘরে সে ঢুকত না, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করত—'বল ডাক্তার, আজ কেমন আছ?' আর রোজ একবার করে বলত 'তুমি হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছ না কেন? হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাও। তোমার খুব খারাপ রোগ হয়েছে। এর বীজানুতে সারা ঘর

ভরে যাবে, আমার পক্ষেও বাঁচা মুশকিল হয়ে পড়বে।' সে প্রত্যেকদিন ঘরের বাইরে থেকে ওই এক কথাই বলে যেত। সে আমাকে পরে ঘৃণা করতে আরম্ভ করল আর সেবা-শুশ্রূষা তো দূরের কথা আমার প্রতি রূঢ় কথা ব্যবহার করতে লাগল।

অবশেষে তার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন হাসপাতালেই ভর্তি হয়ে গেলাম। হাসপাতালে সে খুব কম আসত আর এলেও কাছে না এসে একদিকে দূরে দাঁড়িয়ে নার্সকে জিজ্ঞাসা করত, 'বলুন সিস্টার, ডাক্তারের অবস্থা কেমন ?' এক একদিন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করত, 'কেমন আছ ডাক্তার ?' এসব দেখেশুনে আমার এতদিনে চোখ খুলল। আমি যে পাশ্চাত্য সভ্যতার রঙে রঙিন হয়ে হিন্দুধর্ম, হিন্দুজাতি, আর হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতিকে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতাম, আর খ্রিস্টান সংস্কৃতিকে সবার উপরে ভেবে গর্ব করতাম—সে ভুল ভেঙে গেল, খ্রিস্টান সংস্কৃতিতে ঘৃণা ধরে গেল। হিন্দু সভ্যতার অদ্ভুত মহত্ত্ব আমার মনকে আকর্ষণ করল। সেইসময় আমার মনে এক হতাশভাবের উদয় হল যে, আজ যদি আমি কোনো সনাতন হিন্দুধর্মী মহিলাকে বিয়ে করতাম তবে সেই হিন্দু নারী কত-না স্নেহের সঙ্গে তার 'তন-মন-ধন' সব দিয়ে আমার সেবা-শুশ্রূষা করত।''

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনায় অদ্ভুত ফললাভ

পাদ্রীসাহেব বলতে থাকলেন, ''আমি মনে মনে খুব অনুশোচনা করতে লাগলাম আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি হিন্দুদের অগাধ বিশ্বাস দেখে মনে মনে তাঁকে স্মরণ করলাম। আমি জোড় হাত করে তাঁকে প্রার্থনা জানালাম, 'প্রভু ! হে দয়াময় ! কৃপা করে আমাকে এই দুঃসহ রোগ-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার কর। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, এই বিশ্বাসঘাতিনী খ্রিস্টান নারীকে এখনই পরিত্যাগ করে কোনো গরিব অনাথ ভারতীয় হিন্দু নারীকে

বিয়ে করে সুখে দিন যাপন করব, আর তোমার ভজনায় জীবন কাটিয়ে দেব। এই খ্রিস্টান ধর্মকেও জলাঞ্জলি দিয়ে সনাতন হিন্দুধর্মকেই বরণ করে জীবন ধন্য করব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে আর তাঁকে করুণ প্রার্থনা জানিয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলাম। আমার আর্ত ডাকে প্রভু সাড়া দিলেন, আর ওই অতি ভয়ংকর রোগ থেকে আমি আস্তে আস্তে নিষ্কৃতি লাভ করলাম। আমি এখন দয়াল শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। শাস্ত্রীজী ! তারপর আমি সুস্থ হয়ে আগে ওই কুলটা নারীকে বিদায় করলাম আর লাট পাদ্রীর যে নিয়ম-কানুনে চলতে অভ্যস্ত ছিলাম তাও পরিত্যাগ করলাম। আর এই মুহূর্তে ভগবান বাসুদেবের কী অদ্ভুত কৃপা দেখুন যে, ঠিক সময়েই আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। শাস্ত্রীজী এখন আর দেরি করবেন না, আমাকে যত তাড়াতাড়ি পারেন দেবমন্দিরে নিয়ে গিয়ে তাঁর পবিত্র চরণামৃত দিয়ে হিন্দুধর্মের অমৃত নামে দীক্ষা দিয়ে হিন্দুধর্মের আশ্রয় দান করুন।"

পূজ্যপাদ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রী তক্ষণি মন্দিরে গিয়ে ভগবানের চরণামৃত খাইয়ে তাঁকে হিন্দুধর্মে দীক্ষা দিয়ে দিলেন। তারপর কিছুদিন তাঁর কাছে থেকে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা থেকে পাঠ করে জীবনের সারতত্ত্ব তাঁকে শেখালেন। এইভাবে একজন খ্রিস্টান পাদ্রী সনাতন হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেন।

যে লোক নিজেকে সনাতনধর্মী আর হিন্দু বলতে লজ্জা পায় সে কি এই আশ্চর্যজনক ঘটনা থেকে শিক্ষা নেবে না ? শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ, মনন আর সত্য সনাতন ধর্মের কী অসীম শক্তি, তা জানার পরও সনাতন ধর্মের গৌরবে বুক উঁচু করে নিজের কুল এবং জাতির কল্যাণ সাধনে তৎপর হবে না ?

—— ০ ——

স্বপ্নে-কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত

সন্ত বাবা বৈষ্ণবদাসজী শ্রীরামচন্দ্রের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। সারাটি দিন তিনি শ্রীরামচন্দ্রের ভজনায় অতিবাহিত করতেন। তাঁর কাছে যে কোনো দর্শনার্থী এলে তিনি শুধু তাকে বলতেন 'জীবকে হিংসা করো না, সকলের প্রতি দয়া করো। জীব মাত্রেরই সুখের কারণ হও, আর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করো।' তাঁর সঙ্গে সৎসঙ্গ করে হাজার হাজার লোক জীবহিংসা, প্রাণীহত্যা, মাছ মাংস ডিম মুরগি ইত্যাদি খাওয়া একদম ছেড়ে দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের ভজনায় বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল। মহাবীর হনুমানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য বাবাজী বাঁদরদের লাড্ডু খাওয়াতেন, আর লুচি মিষ্টি দিয়ে মহাবীরের ভোগ দিতেন। তিনি কায়মনোবাক্যে কারো প্রতি হিংসা করতেন না বা কাউকে দুঃখ দিতেন না। সকলকে এই উপদেশই দিতেন।

স্বপ্নে-কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত—দেহত্যাগ

প্রতিদিনের মতো একদিন ভক্তরা এসে দেখে কী বাবাজীর মুখ অন্যদিনের মতো প্রসন্ন নয়। তাঁকে দেখে বেশ চিন্তাগ্রস্ত মনে হল। কী কারণে তিনি এমন বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন কেউ বুঝতে পারল না। একজন ভক্ত তাঁকে সাহস করে জিজ্ঞাসা করল :

ভক্ত—'মহারাজ ! একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?'

মহারাজ—'বল।'

ভক্ত—'আজ আপনি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছেন ?'

মহারাজ—'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ।'

ভক্ত—'কেন মহারাজ ?'

মহারাজ—'আজ আমি এক জঘন্য পাপ করে ফেলেছি।'

ভক্ত—'আপনি আবার কী পাপ করেছেন ?'

মহারাজ—'সে কথা শুনতে চেয়ো না।'

ভক্ত—'পাপ, তা আবার আপনি করেছেন ? এ তো অসম্ভব কথা শুনছি। ঠিক করে বলুন কী হয়েছে ?'

মহারাজ—'না ভাই ! হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, ব্যাস্, জিজ্ঞাসা করো না। আমি জঘন্য পাপ করে ফেলেছি।'

ভক্ত—'না মহারাজ, আপনাকে বলতেই হবে।'

মহারাজ—'এমন পাপ করেছি যে, খাওয়াদাওয়া, ঘুমানো সব আমার বিস্বাদ লাগছে।'

ভক্ত—'শেষ পর্যন্ত কী পাপ হয়েছে বলুন না !'

মহারাজ—'আজ রাত্রে আমি যে স্বপ্ন দেখেছি, তার কথা আর শুনতে চেয়ো না ভাই !'

ভক্ত—'না মহারাজ, সে কথা আপনাকে বলতেই হবে।'

মহারাজ—'ভাই ! আমি কী করি বলত ! স্বপ্নে আমি যে জঘন্য পাপ করে ফেলেছি তা মহাত্মাদের পক্ষে কখনোই করা উচিত নয়। স্বপ্নে দেখলাম কী আমি নিজের হাতে একটি বাঁদরকে মেরে ফেলেছি। আর এই পাপের চিন্তা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। হায় ! হায় ! আমি শেষে স্বপ্নে বাঁদর মারলাম ! আমার মনে হয় আমার উপর হনুমানজী খুব রুষ্ট হয়েছেন, তাই আমি এই ঘোর পাপ কাজটা করেছি।'

ভক্ত—'মহারাজ ! আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। এ তো স্বপ্ন। আর স্বপ্ন কবে সত্য হয়েছে ? স্বপ্ন তো শুধু দেখাই যায়।'

মহারাজ—'আরে ভাই ! আমার কি এই স্বপ্ন দেখা উচিত ? কোনো ভালো স্বপ্ন আমার ভাগ্যে লেখা নেই ? বাঁদর মারা তো মহাপাপ। এর চেয়ে জঘন্য পাপ আর কী আছে ? শাস্ত্রে আছে যদি ভুল করেও কোনো বাঁদরকে মারা যায় তো, যে মারে সে নরকে যায়, আর যতদিন চারধাম পায়ে হেঁটে ঘুরে না আসছে ততদিন তার ওই পাপ ক্ষয় হয় না। আর আমি স্বপ্নে বাঁদরটাকে মারলাম !! কী পাপ যে করলাম !!!'

ভক্ত—'শুনুন মহারাজ ! আপনি স্বপ্নের কথা ভেবে বৃথাই দুঃখ

পাচ্ছেন। স্বপ্ন কোনোদিন সত্যি হয় না।'

মহারাজ—'ভাই ! এমন ঘোর পাপের স্বপ্ন দেখা কি উচিত ? স্বপ্ন তো আমারই চিন্তার ফসল।'

ভক্তরা তো সাধু-বাবাকে অনেক করে বোঝাল কিন্তু তাঁর দুঃখ কিছুতেই দূর হল না। স্বপ্নে তাঁর হাতে বাঁদর মরেছে বলে তিনি খাওয়া-দাওয়া সব ছেড়ে দিলেন আর দিনরাত হনুমানজীর কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলেন।

একদিন ভক্তরা এসে দেখল বাবাজীর শরীরে কী যেন ঘিয়ের মতো মাখানো আর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাবাজীর পরনের কাপড়চোপড় আগুনে জ্বলছে আর তিনি 'রাম, রাম, রাম, রাম' নাম জপ করছেন। ভক্তরা দৌড়ে বাবাকে রক্ষা করার জন্যে ছুটে যেতেই তিনি দু-হাত তুলে তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করলেন। বললেন—'ওইখানেই সবাই থাক, আমাকে ছুঁয়ো না। আমি পাপী, আমি স্বপ্নে বাঁদর মেরেছি, এখন আমি হাসতে হাসতে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি।'

প্রকৃত সাধু তিনিই যিনি স্বপ্নেও কোনো জীবহিংসা করেন না, আর কাউকে দুঃখ দেন না।

—— ০ ——

শ্রীশ্রীসীতারামের কৃপায় এক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারের প্রাণরক্ষা

বিরাগী সম্প্রদায়ের বিখ্যাত সন্তগুরু স্বামী রমেশচন্দ্রজী একবার তাঁর সৎসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারের কথা উল্লেখ করেছিলেন। কীভাবে ওই ভদ্রলোক ভগবান রামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর কৃপায় আত্মহত্যা থেকে বিরত হন তার কথা সবিস্তারে শুনিয়েছিলেন।

স্বামীজী ওই ইঞ্জিনিয়ারকে বিহারের এক শহরে লাল রঙের কাপড় পরে বৈষ্ণবের বেশে ঘুরে বেড়াতে দেখেন। তিনি সেই সাধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন তিনি একজন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার। এ কথা শুনে তিনি খুবই আশ্চর্য হয়ে যান, পরে তাকে পাশে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'বাবা! আপনার জীবনে এরকম অদ্ভুত পরিবর্তন কী করে হল?'

উত্তরে ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁদো কাঁদো স্বরে স্বগোতক্তি করেন, 'হায়! আমি কেন এই ধর্মের দেশ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিনি, তাহলে আমার জীবনের এতগুলো দিন বৃথা নষ্ট হত না। এই দিনগুলো আমি সীতারামজীর ভজন না করেই কাটিয়ে দিয়েছি। আর বাবাজীর দিকে চেয়ে তাঁর জীবনের এক আশ্চর্য ঘটনার কথা শোনান। তাঁর কথায়—

'আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম। ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলাম বিহারের একটা জলের বাঁধ তৈরির ভার নিয়ে। বাঁধ তৈরির কাজ পুরোদমে চলছিল আর সে সময় হঠাৎ ভীষণ বর্ষা শুরু হয়ে গেল। এত বর্ষা যে বাঁধ ভেঙে পড়ার উপক্রম হল। বাঁধে ফাটল দেখা দিল, এবার বাঁধ যে ভেঙে পড়বেই তার কোনো সন্দেহই রইল না। বাঁধ ভেঙে গেলে আমি আর আমার দেশের বদনাম হবে এই ভয়ে আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম।

একদিন এই দুশ্চিন্তা নিয়ে বাঁধের উপর পায়চারি করছিলাম। তখন দূরে তাকিয়ে দেখলাম কতকগুলো বাঁধেরই কর্মী-মজদুর খোল-করতাল বাজিয়ে খুব কীর্তন করছে আর নাচছে। ওরা ওরকম নাচানাচি করছে কেন তা জানবার জন্যে ওদের কাছে গেলাম। দেখলাম একটা ছোট্ট মতো মন্দির আর তার সামনে ওরা সবাই মিলে মনের আনন্দে তন্ময় হয়ে গাইছে আর বাজনার তালে তালে নাচছে। ব্যাপার কী আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কারণ আমার জীবনে এই রকম আমি প্রথম দেখছি। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম এই নাচ-গানের উদ্দেশ্য কী। তার উত্তরে মজুররা বলল, 'সাহেব এই মন্দির হচ্ছে আমাদের দেবী সীতামায়ের মন্দির, আমরা তাঁর সামনে কীর্তন করছি। যে এই মন্দিরে সীতামায়ের সামনে পবিত্র মনে কোনো প্রার্থনা জানায় তার সেই ইচ্ছা পূরণ হয়, আর তার সব কাজই সফল হয়।' আমি তাদের বললাম, 'ভাই তোমরা আমার হয়ে সীতামায়ের কাছে প্রার্থনা কর যেন আমার বাঁধটা রক্ষা পায়, ভেঙে না পড়ে। যদি আমার বাঁধ বাঁচে তবে আমি সীতামায়ের একটা মস্ত মন্দির তৈরি করে দেব আর তার সমস্ত খরচ বহন করব।'

তারা আমাকে বলল, 'সাহেব! প্রথমে আপনি একবার জোড়হাত করে মনে-প্রাণে সীতামায়ের কাছে প্রার্থনা করুন, যেন উনি আপনাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেন, তারপরে আমরা আপনার হয়ে প্রার্থনা করব।'

আমি মূর্তির সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা করলাম, 'হে মাতা সীতাদেবী! আমার সম্মান এবং প্রাণ দুই-ই রক্ষা কর মা। যদি বাঁধ ভেঙে যায়, তাহলে আমি আত্মহত্যা করব আর যদি বেঁচে যায় তাহলে আমার এই জীবনটা তোমার সেবায় নিয়োজিত করব।' তারপর তারাও আমার হয়ে দেবীর সামনে ভক্তিভরে প্রার্থনা জানাল। তাদের আত্মবিশ্বাস এতই প্রবল যে, তারা আমাকে বলল, 'যাও সাহেব, তোমার কাজ হয়ে যাবে। তোমার বাঁধ আর ভাঙবে না।' আমি বাংলোয় ফিরে এলাম। ওইদিন সন্ধ্যায় আবার মুষলধারে বৃষ্টি নামল। ভাবলাম বাঁধ আজ আর কিছুতেই টিকবে না, ভেঙে পড়বেই। তাই নিজের হাতে একটা চিঠি

লিখে রাখলাম যে, 'আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়, আমি নিজের ইচ্ছায় আত্মহত্যা করছি।' চিঠিটা লিখে টেবিলের উপরে চাপা দিয়ে রেখে দিলাম। ঠিক করলাম বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে থাকব আর বাঁধ ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও তলিয়ে যাব। আমি যখন বাঁধের উপরে গেলাম তখনও অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। বাঁধের উপরে উঠে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি কী দুজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে! একজনের রং খুব ফর্সা আর একজন শ্যামবর্ণ। ফর্সা যুবকটি নিজের হাতে জমি থেকে মাটি কেটে ঝুড়িতে করে শ্যামবর্ণের যুবকটির হাতে দিচ্ছে আর ওই যুবকটি সেই মাটি নিয়ে বাঁধের ফাটল মেরামত করছে। দেখলাম দুজনের মাথাতেই মুকুট রয়েছে, আর কাঁধে তীর ধনুক ঝুলছে। দুজনকেই দেখতে অপূর্ব সুন্দর।

এই দেখে আমি মজুরদের জোরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম, আর বললাম 'তোমরা তাড়াতাড়ি তোমরা এস, নীচে লোক দুজনকে বাঁধের কাছ থেকে সরাও, নইলে ওরা দুজনই এখনই মারা পড়বে।' মজুররা দৌড়ে আমার কাছে এল, আর নীচে তাকিয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু তারা ওই যুবক দুজনকে দেখতে না পেয়ে বলল, 'কই সাহেব! আমরা তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। বোধহয় চলে গেছে।' আমি বললাম, 'না না ওই তো ওরা মাটি দিচ্ছে। দেখো ভালো করে। একজন খুব ফর্সা আর একজন কালো। দুজনের মাথাতেই মুকুট রয়েছে আর কাঁধে দেখ তীর ধনুক ঝুলছে।' ওরা তখন বলল, 'সাহেব! ওরা তরুণ যুবক নয়, ওঁরা তো সাক্ষাৎ রামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ। আপনি খুব ভাগ্যবান যে, আপনি তাঁদের দর্শন পেলেন। আপনার বাঁধ আর কোনোক্রমেই ভাঙবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কেননা যে দেবী সীতা মায়ের সামনে আপনি প্রার্থনা করেছেন তাঁরই পতিদেবতা শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং আপনার বাঁধ বাঁচানোর চেষ্টা করছেন।'

এইসব শুনে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম, তারপর ওরা আমাকে সেখানে থেকে তুলে নিয়ে এসে বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে গেল। জ্ঞান ফিরলে, রামলক্ষ্মণ যে আমার বাঁধ বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন, এইকথা ভেবে আমি নিজেকে তাঁদের পায়ে সমর্পণ করার জন্যে প্রস্তুত হলাম। সে যাত্রায়

বাঁধ বেঁচে গেল, আর আমিও কোট, প্যান্ট, টুপি, টাই সব খুলে ফেলে দিয়ে টাকাকড়ি ধনসম্পদ সব তুচ্ছ করে সন্ন্যাস নিয়ে বনের দিকে পা বাড়ালাম। এখন সব সময় রামসীতার ভজনা নিয়ে পড়ে থাকি, আর যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই হাতজোড় করে বলি 'ভাই, দয়া করে সীতারাম বলো ('My child ! please say Sita-Rama')। সীতারাম উচ্চারণে, আর তাঁর নাম সর্বদা মনে মনে জপ করলে মনে শান্তি পাবে, মনের প্রসন্নতা বাড়বে। সব কাজ সিদ্ধ হবে।'

তিনি স্বামীজীর দিকে চেয়ে বললেন, 'বাবা দুঃখ যদি কিছু থাকে তো সে এই ভেবে যে, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে কেন আমার জন্ম হয়নি ? আমার জীবনের এতগুলো দিন শ্রীশ্রীসীতারামজীর বিনা ভজনায় কেটে গেল ? জীবনটা আমার বৃথা হয়ে গেল !'

———— ∘ ————

৫/ গায়ত্রী জপের সাক্ষাৎ ফল

(এক বিখ্যাত আর্যসন্ন্যাসীর জীবনের সত্য ঘটনা)

অনেক দিন আগেকার কথা। একবার এক আর্যসন্ন্যাসী আনন্দস্বামী সরস্বতী পিলখুবায় এসেছিলেন। সন্ন্যাস জীবনের আগে তিনি 'মিলাপ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল স্যার খুশালচন্দ্র। এখানে এসে তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে সৎসঙ্গের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শুনে এখানকার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি ছিলেন গায়ত্রীমাতার পরম ভক্ত। গায়ত্রী জপকে তিনি জীবনের চরম এবং পরম কর্ম বলে বিবেচনা করতেন। গায়ত্রী জপের চমৎকারিতা, সঙ্গে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের জপ—তার যে কী অসীম শক্তি, তা তাঁর নিজ জীবনের উপলব্ধি থেকে শুনিয়েছিলেন। গায়ত্রী জপের প্রয়োজনীয়তা, তার বিশেষ ক্রিয়া এবং জপের প্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে ওই সৎসঙ্গে বসে একজন ছাত্রের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন এবং উদাহরণসহ ব্যাখ্যা পাঠকগণের সামনে আর একবার হুবহু বর্ণনা করছি। পাঠকবৃন্দ দয়া করে মনোযোগ দিয়ে অবশ্যই পড়বেন।

এক ছাত্র—'মহারাজ ! আমাদের কী কর্তব্য ?'

স্বামীজী—'বাবা ! ভক্তিভরে গায়ত্রীমাতার জপ করলেই সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। জীবনে সব পাবে। আর হ্যাঁ, গায়ত্রী জপের সঙ্গে এই মন্ত্রের আদেশকেও জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত করে নেওয়া চাই। এর ফলে মন্ত্রজপ সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হবে।'

ছাত্র—'মহারাজ ! আমরা তো গায়ত্রী জপ করতে চাই। কিন্তু অনেকে বলে যে, পৈতে না হলে গায়ত্রী জপ করা যায় না। বিনা পৈতেয় গায়ত্রী জপ করলে পাপ হয়। তাহলে তখন কী করা উচিত ?'

স্বামীজী—'এখন তোমাদের উচিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করা আর তারপর গায়ত্রী জপ করা। এতে তোমাদের আপত্তি কিসের ? হিন্দু হয়ে যজ্ঞোপবীত সংস্কার না করানো তো অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।'

ছাত্র—'মহারাজ ! যদি কেউ যজ্ঞোপবীত সংস্কার না করাতে চায় তাহলে কী হবে ?'

স্বামীজী—'যদি ভগবান রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের ছত্রছায়ায় থাকতে চাও তো তোমার যজ্ঞোপবীত ধারণ অবশ্য করণীয়। আর যদি নিজের উন্নতি চাও তাহলে গায়ত্রীমাতার স্মরণ নাও। গায়ত্রী মাতাকে ভক্তিভরে ডাক আর প্রতিদিন গায়ত্রীমাতার কোলে বসে অমৃত পান কর।'

ছাত্র—'আপনার যে গায়ত্রীমাতার প্রতি এত ভক্তি, তা, তাঁর জপের ফলে আশ্চর্যজনক কোনো ফল পেয়েছেন বা দেখেছেন ? মন্ত্রজপের দ্বারা বাস্তবে কোনো কাজ সিদ্ধ হয় ?'

স্বামীজী—'শুধু দেখেছি নয়, ভালোভাবে দেখেছি, বুঝেছি। গায়ত্রী এবং মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপের বিশেষ ক্ষমতা আমি নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছি। এই মন্ত্র মহা মহা ভয়ংকর-ভয়ংকর বিপত্তি থেকে মানুষকে রক্ষা করে, আর ফাঁসির দড়ি থেকেও বাঁচিয়ে নিয়ে আসে। আমি এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিজের চোখে দেখেছি। আমার ছেলে রণবীর, 'মিলাপ' পত্রিকার সম্পাদক, ওর একবার সেসন কোর্টে ফাঁসির হুকুম হয়। আমি রণবীরের সঙ্গে জেলে দেখা করে তাকে বলি 'বাবা, তুমি গায়ত্রীমাতার স্মরণ নাও। সোয়ালক্ষ বার গায়ত্রী জপের সঙ্গে

"ওঁ ত্র্যম্বকং য জামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতান্।।"

এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের জপ করো। তুমি নিশ্চয়ই ফাঁসির হুকুম থেকে রেহাই পাবে। এধারে তুমি জেলে বসে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র, সঙ্গে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করো, আর ওধারে আমি পুরুষার্থের সাহার্যে যা করণীয়, তোমাকে

ফাঁসি থেকে বাঁচাবার জন্য সে সকল কাজ করব। প্রভুর আরাধনা আর সেইমতো চেষ্টা দুই-এ মিলে নিশ্চয় কার্যসিদ্ধি হবে। সে তখন আমার কথামতো মন্ত্র জপ আরম্ভ করে দিল। বড় বড় উকিল ব্যারিস্টার সবাই বলেছিল, সে কিছুতেই ছাড়া পাবে না, কিন্তু আমি বলেছিলাম, 'আমি এখানকার আদালতের থেকেও বড় আদালতে, যেটা সবচেয়ে বড় আদালত, সেখানে আপিল করে রেখেছি। সেখানে অবশ্যই আমার শুনানী হবে।' যেদিন সোয়ালক্ষ জপ শেষ হল ঠিক সেইদিন সত্যিই রণবীর ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে এল। কাজেই, এরকম মন্ত্র জপে ফাঁসির সাজা থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। যে মন্ত্র ফাঁসির সাজা থেকে রক্ষা করতে পারে, ওই মন্ত্র কি রোগ-ব্যাধি সারাতে পারে না, না কি কোনো বস্তু লাভ করাতে পারে না ? বিশ্বাস আর ভক্তির সঙ্গে জপ করলে এর দ্বারা সব পাওয়া যায়, আর রোগ, শোক যন্ত্রণা ইত্যাদি সব নিরাময় হয়।

ছাত্র—'আপনার জীবনের আরো কিছু সত্য ঘটনার কথা শোনান যাতে আমাদের উপকার হবে।'

স্বামীজী—'শোন, বলছি। গায়ত্রীমাতার অতি অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি। গায়ত্রীমাতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি থাকলে, গায়ত্রীর স্মরণ নিলে আমাদের ইহলোক পরলোক সবই সুন্দর হবে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। গায়ত্রী মন্ত্র জপে আর গায়ত্রীমাতার প্রতি শ্রদ্ধায় কী হতে পারে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি পেয়েছি। সে সম্বন্ধে তোমাদের বলছি।'

ছোটবেলায় আমার বুদ্ধি খুব স্থূল ছিল। আমি স্কুলে যেতাম, মাস্টারমশাইরা পড়া বোঝাতেন কিন্তু আমার মাথায় কিছুই ঢুকত না। পড়া একদম মনে থাকত না। প্রত্যেক পিরিয়ডে মার খেতাম কিংবা স্কুলের ছুটি না হওয়া পর্যন্ত বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকতাম। স্কুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাস্টারমশায়দের বকুনি শুনতে হত আর না হলে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হত ; এদিকে আবার বাড়ি ফিরলে বাবার ধমকানি, ধিক্কার আমার

নিত্য পাওনা ছিল। বাবা দাঁত খিঁচিয়ে বলতেন, 'এমনি করে জীবনটা নষ্ট করবি ? কেন পড়া পারিস না ?'

স্কুলে এবং ঘরে দুই জায়গাতেই অপমানিত হতে হতে জীবনের উপরে বিতৃষ্ণা এসে গেল। ঠিক করলাম আত্মহত্যা করব। একদিনের কথা। তখন বর্ষাকাল। আমাদের গ্রামের নদীতে বান এসেছে, প্রবল বেগে স্রোত বয়ে চলেছে। আমি নদীর পুলে উঠে দাঁড়ালাম আর চারিদিকে তাকিয়ে কেউ কোথাও নেই দেখে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কিন্তু মরলাম না, ভাসতে ভাসতে পাড়ে গিয়ে ঠেকলাম। গাঁয়ের লোক দেখে চিনতে পেরে তুলে এনে ঘরে দিয়ে গেল। এইরকম তখন আমার মনের অবস্থা।

কিন্তু আমার ভাগ্য একদিন সুপ্রসন্ন হল। একদিন হঠাৎ এক সাধু স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজ এলেন আমাদের বাড়িতে। এখানেই তাঁর পাকাপাকি থাকার ব্যবস্থা হল। স্বামীজীর খাবার পৌঁছে দেবার ভার পড়ল আমার উপর। আমি প্রত্যেকদিন তাঁর খাবার নিয়ে যেতাম।

একদিন পড়া না পারার জন্যে স্কুলে এবং ঘরে দুই জায়গাতেই মার খেয়েছিলাম ফলে কাঁদতে কাঁদতে চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। সেইদিন দুপুরে মহারাজের জন্যে অন্যদিনের মতো খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম আর খাবারের থালা তাঁর সামনে রেখে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মহারাজ খেতে খেতে আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন। খাওয়া হয়ে যাবার পর উনি আমাকে নাম ধরে কাছে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল, কী হয়েছে ? আজ খুব মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে ?' আমি বললাম, 'না, আমার কিছু হয়নি ?' মহারাজ বললেন, 'কিছু হয়নি বললে শুনব, কিছু নিশ্চয় হয়েছে। বল, কী হয়েছে ? আজ তোর চোখ লাল হয়ে রয়েছে, খুব কেঁদেছিস মনে হচ্ছে ?' এই শুনে আমি আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। তখন তিনি আদর করে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে তাঁর কোলে বসালেন আর জিজ্ঞাসা করলেন,

'বল, তোর কিসের দুঃখ যার জন্য এত কাঁদছিস ; দেখি আমি কী করতে পারি।' আমি বললাম, 'বাবা ! আমি বাঁচতে চাই না, আমি খুবই স্থূল বুদ্ধির ছেলে। যার ফলে যেখানে সেখানেই অপমানিত হচ্ছি। তাই আমাকে আপনি মরবার সহজ-সরল পথ বলে দিন।' মহারাজ এ কথা শুনে বলতে লাগলেন, 'আরে ! তুই এর জন্যে এত কষ্ট পাচ্ছিস ? তোর রোগের ওষুধ আমার কাছে আছে রে। তুই আর চিন্তা করিস না।' আমি খুব আগ্রহ নিয়ে তার দিকে চেয়ে বললাম, 'তাই বলুন আমাকে।' তিনি আমাকে একটা সাদা কাগজ আনতে বললেন। আমি কাগজ এনে দিলাম। তিনি সেই কাগজের উপরে গায়ত্রী-মন্ত্র লিখে আমাকে আদেশ করলেন, 'এই তোর রোগের চিকিৎসা। খুব ভোরবেলা যখন ঘরের সবাই ঘুমোবে তখন তুই উঠবি, আর হাতমুখ ধুয়ে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে কুশের আসনে বসে আজ্ঞাচক্রের (দুই ভুরুর মাঝে) উপরে মন রেখে ধ্যান করতে করতে এই মন্ত্র জপ করবি।' এই বলে মহারাজ আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

এই মন্ত্র নিয়ে আমার মনে হল, আমি যেন বিরাট কিছু একটা পেয়ে গেছি। তখন থেকে আমি স্বামীজীর আদেশমতো ভোর সাড়ে তিনটেয় উঠে স্নানটান সেরে এক আসনে বসে ধ্যানে গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসত, বসে থাকতে পারতাম না। চোখে জলের ঝাপটা দিতাম, আবার ধ্যানে বসতাম কিন্তু তাতেও ঘুম আসত। এর থেকে রেহাই পেতে একটা উপায় বের করলাম। আমার খুব লম্বা টিকি ছিল। একটা বড় দড়িতে টিকিটাকে বেঁধে দড়িটা ছাদের কড়ির সঙ্গে বেঁধে নিলাম। এবার জপ করতে করতে যখনই ঘুমে আমার মাথা ঝুঁকে পড়ত তখনই টিকিতে টান লাগত আর অমনি ঘুমঘুম ভাবও দূর হয়ে যেত। আমি ঠিক হয়ে যেতাম। এইরকমভাবে খুব শ্রদ্ধা আর ভক্তির সঙ্গে একাগ্রমনে গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করতে লাগলাম। চার পাঁচ মাস পর গায়ত্রী-মন্ত্র জপের

চমৎকার ফল পেলাম। আগে আমি যে জিনিস ভালো করে বুঝতে পারতাম না, সেই অঙ্ক, ইংরাজি, হিন্দি, ইতিহাস সব বেশ ভালোভাবে মনে থাকছে। বাৎসরিক পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে পাস করলাম। মাস্টারমশাইরা আমাকে পাস করতে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন, আর আমাকে বললেন, 'তোর তো কিছুই মনে থাকত না, তুই কী করে পাস করলি ? নিশ্চয় তুই কারো দেখে নকল করেছিস।' আমি বললাম, 'না তা নয়।' তারপর থেকে যে পরীক্ষাই হয় তাতেই আমি ভালো নম্বর পেয়ে পাস করে যেতে লাগলাম। আর মাতা গায়ত্রীর কৃপায় আমার বুদ্ধি দিন দিন শান্ত ও তীক্ষ্ণ হতে লাগল। যখন কর্মক্ষেত্রে ঢুকলাম তখনও নিরন্তর উন্নতির দিকে এগোতে লাগলাম। গায়ত্রীমাতার কৃপায় বিষয়-সম্পত্তিও লাভ করতে সক্ষম হলাম। গোরু, মোষ, বাড়ি, গাড়ি, পুত্র-পৌত্র ইত্যাদি যত-রকম বিষয়-সম্পদ আছে সব পেলাম। এই সমস্ত লাভ করার পর গায়ত্রী জপের ফলে এমন শক্তি লাভ করলাম যে, এই সবকিছুকেও লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে আত্মদর্শনের চিন্তায় রত হলাম। এখন আমার বয়স পঁচাত্তর বৎসর হয়ে গেছে, আর ন-বছর বয়সের পর থেকে ধরলে আমি যা পেয়েছি সব গায়ত্রীমাতার কৃপাতেই পেয়েছি। আমার জীবনে এমন কোনো রাত বা দিন নাই যখন আমি গায়ত্রী জপের আনন্দ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে থাকি। গায়ত্রীর আরাধনায় ইহলোক এবং পরলোক দুই-ই আনন্দের হয়ে ওঠে। অথর্ব বেদে বলা হয়েছে গায়ত্রী জপকারী ব্যক্তির আয়ু, বল, স্বাস্থ্য, সন্তান, ধন-সম্পদ, কীর্তি, পশু, ঈশ্বরসান্নিধ্য ইত্যাদি সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ হয়, এবং অন্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। কী এমন জিনিস আছে যে গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করে পাওয়া যায় না ? তাই গায়ত্রীমাতার স্মরণ আর গায়ত্রীমাতার প্রতি অনন্য ভক্তি অবশ্যই প্রয়োজন।

কত বিপদ থেকে গায়ত্রীমাতা আমাকে রক্ষা করেছেন ! তাই বা কেন আজ যে আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আর আজ পর্যন্ত জীবিত

আছি সে একমাত্র গায়ত্রীমাতার কৃপায় আর কারো কৃপায় নয়। আমি একবার কৈলাস ভ্রমণে গিয়েছিলাম, সে এক ভয়ংকর বিপদসংকুল রাস্তা। পাহাড়ি চড়াই-এ উঠতে উঠতে পড়ে গিয়ে আমার পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। আমি রাস্তায় পড়েছিলাম, আমার সঙ্গীরা সব আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আমি একলা বসে বসে গায়ত্রীমাতাকে স্মরণ করে প্রার্থনা জানাই, 'মাগো, তুমি আমাকে রক্ষা কর। এখানে মা তুমি ছাড়া আমাকে দেখবার আর কেউ নেই।' মা আমার প্রার্থনা স্বকর্ণে শুনেছিলেন। আমার মধ্যে এমন শক্তি দান করলেন যে আমি আবার উঠে দাঁড়ালাম। বুঝতে পারলাম আমার ভাঙা হাড় জোড়া লেগে গেছে। আর আমি হেঁটে হেঁটেই কৈলাসে গিয়ে পৌঁছলাম। এ আমার জীবনে গায়ত্রীমাতার অদ্ভুত কৃপার এক জলন্ত প্রমাণ। গায়ত্রীমাতার কৃপায় আমি সব পেয়েছি। গায়ত্রীমাতার প্রতি ভক্তিতে মানুষের এমন কোনো চাওয়া নাই যা পূরণ হয় না। যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখবে তার এ জগতে কিছুই অপ্রাপ্য থাকবে না, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু গায়ত্রীর মন্ত্র জপের অধিকারী (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) যজ্ঞোপবীতধারী হতে হবে। যম, নিয়মাদি পালন করে গায়ত্রী-মন্ত্র জপ অধিক ফলদায়ক।

— ০ —

অশ্বত্থ গাছের বিস্ময়কর কাহিনী

(মুসলমান রাজমিস্ত্রীর নিজের চোখে দেখা এক সত্য ঘটনা)

সন্ত মলুকদাস বলেছেন :

হরী ডাল মত তোড়িয়ে লাগৈ সূখা বান।
দাস মলুকা যোঁ কহৈ অপনো সো 'জিয়' জান॥
তোমার মতো আছে জেনো সবুজ গাছের প্রাণ।
ভাঙলে শাখা তারও বুকে বাজে বিষম বান॥
নিজের ব্যথা গাছের ব্যথা কোনো তফাৎ নাই।
মলুকদাস ডেকে বলে সমঝে চলো ভাই॥

আর একজন সন্ত বলেছেন :

সাধু ঐসা চাহিয়ে জো দুখৈ দুখাবৈ নাঁয়।
ফুল পাত 'তোড়ৈ' নহীঁ রহৈ বগীচে মাঁয়॥
সাচ্চা সাধুর বুকে বাজে দুঃখীজনের দুখ।
ফুলে ভরা গাছের সুখে উথলে ওঠে বুক॥

আজকালকার শিক্ষিত সমাজের লোকেরা অশ্বত্থ, তুলসী, বেল ইত্যাদি গাছকে পূজা করা এবং গাছকে জীবের মর্যাদা দেওয়াকে অর্থহীন এক কুসংস্কার বলে মনে করে। কিন্তু 'সাড়া প্রবণতাই জীবের লক্ষণ' এই অনুসারে এক মুসলমান মিস্ত্রী অশ্বত্থ গাছ যে জীবন্ত এবং তাকে কাটলে যে তার আমাদের মতোই কষ্ট হয় তথা লোভের বশে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে এক অশ্বত্থ গাছকে কাটার পর তার যে বিষময় ফল সে স্বচক্ষে দেখেছিল তার কথাই আমাদেরকে শুনিয়েছিল।

শাস্ত্র-পুরাণের কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য আর মানুষ তার বিপরীত কর্ম

করে যে ফল হাতে হাতে পায় তারই উদাহরণস্বরূপ এই কাহিনী।

কাঁচা অশ্বত্থ গাছকে কাটা এবং তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার চরম ফল

১৯৫৭ সালের জুন মাস। পিলখুবায় আমাদের একখানা বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। কাজের লোকজনদের মধ্যে একজন মুসলমান রাজমিস্ত্রি ছিল। তার নাম সৈয়দ খাঁ, বাড়িও পিলখুবাতেই। একদিন দুপুরে আমি তাদের কাজ তদারকি করছি, এমন সময় কে যেন আমাদেরকে এসে বলল, অমুক জায়গায় সরকার থেকে বাঁদর ধরা হচ্ছে ; আর যারা ধরছে তারা বাঁদরগুলোকে ভীষণ কষ্ট দিয়ে ধরছে আর খাঁচায় ভরে ফেলছে। ওগুলোকে আবার আমেরিকায় চালান দেবে। এরকম কথা শুনে আমাদের সকলের মনেই বেশ দুঃখ হল।

সৈয়দ খাঁ বলল, 'ভক্তজী ! এ তো বাঁদরের কথা (গল্প), ওদের তো কষ্ট হয়ই, হতেই পারে, আর ওরা কষ্ট পেলে চিৎকার করতেও পারে। যেখানে বাঁদর ধরা হয় সেখানে মহামারী দেখা দেয় শুনেছি। যদিও আমি মুসলমান তবু সত্যি কথা গোপন করব না। এতো গেল বাঁদরের কথা। আমি একটা অশ্বত্থ গাছের আশ্চর্যজনক ঘটনা নিজের চোখে দেখেছি, আর মর্মে মর্মে বুঝেছি যে অশ্বত্থ গাছের মধ্যেও আমার আপনার মতো প্রাণ আছে আর আমার আপনার মতোই সেও সুখদুঃখ ভোগ করে। সেও মানুষের মতো কথা বলে আর তাকে কাটলে, তার প্রতি হিংসা করলে বা বিশ্বাসঘাতকতা করলে তার শাস্তি হাতে হাতে পেতে হয়। লোকে যে বলে অশ্বত্থ গাছ দেবতা—তা বর্ণে বর্ণে সত্যি, তার প্রমাণ আমি নিজের চোখে দেখেছি।

এই কথা শুনে আমরা সকলেই আসল ঘটনাটা কী জানবার জন্যে সৈয়দ খাঁকে ধরে বসলাম। আমরা বললাম, 'আচ্ছা মিঁঞাসাহেব আপনি নিজের চোখে ঘটনাটা যেমন যেমন দেখেছেন আমাদের কাছে বলুন তো।'

মিঁঞা সইদ খাঁ বলল, যা আমি নিজের চোখে দেখেছি তাই আপনাদের বলছি। 'ঘটনাটা অন্য কোথাওকার নয়, এই পিলখুবারই ঘটনা। একবার

আমার এক মুসলমান কাঠমিস্ত্রি বন্ধু দলবীর খাঁ এক রাজপুতের কাছ থেকে একটা তরতাজা অশ্বত্থ গাছ কিনেছিল আর তার মূল্যস্বরূপ একশো টাকা তাকে দিয়েছিল। সে তার সঙ্গে আর একজন অংশীদার জুটিয়ে নিয়েছিল যার নাম ছিল ইসাক খাঁ, সেও কাঠমিস্ত্রি। দলবীর আর ইসাক নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে যে, দুজনে মিলে গাছটা কাটবে, আর সেটা বিক্রি করে যা লাভ হবে (ওই একশো টাকা বাদ দিয়ে) তা দুজনে সমান ভাগ করে নেবে। গাছ কাটার দিনও ঠিক হয়ে গেল।

অশ্বত্থ গাছের প্রাণ ভিক্ষা

যেদিন অশ্বত্থ গাছটা কাটা হবে ঠিক তার আগের দিন রাত্রে দলবীর খাঁ ওই অশ্বত্থ গাছটাকে স্বপ্নে দেখল। স্বপ্নে অশ্বত্থ গাছটা দলবীরকে বলল, 'দেখ দলবীর ! তুই আমাকে কাটিস না, আমার উপর হিংসা করিস না। তুই আমাকে নিজের মনে করে ছেড়ে দে, আর তুই যে আমার মূল্য হিসেবে রাজপুতকে একশো টাকা দিয়েছিস এবং আমাকে কেটে বিক্রি করে যে লাভ হবে সে সব টাকা একসঙ্গে পেয়ে যাবি। আমার গোঁড়ায় অমুক জায়গায় সোনা পোঁতা আছে, তুই গিয়ে মাটি খুড়ে বার করে নে। আর ওই সোনাটা বিক্রি করে যে টাকা পাবি তাই নিয়ে তুই সন্তুষ্ট থাক। তবু তুই আমাকে কাটিস না। আমি তোর কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি।'

দলবীরের ঘুম ভেঙে গেল, আর স্বপ্নের কথা মনে করে খুব অবাক হল। জীবনে সে আজ পর্যন্ত এরকম স্বপ্ন কোনোদিন দেখেনি। প্রথমে তো ওর বিশ্বাসই হল না যে, স্বপ্ন কখনো সত্যি হতে পারে, না অশ্বত্থ গাছের প্রাণ আছে, সে কথা বলে ; না তার সুখদুঃখ আছে ? পরক্ষণেই সে ভাবল, আচ্ছা দেখা যাক না, চুপচাপ গিয়ে সোনা পাওয়া যায় কি না দেখে আসি। এতে আমার লোকসানই বা কী ? যদি সোনা পাওয়া যায় নিয়ে আসব, না হলে ফিরে আসব। এই ভাবতে ভাবতে সে বিছানা ছেড়ে উঠল। আর চুপিচুপি অশ্বত্থ গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সে স্বপ্নে শোনা কথামতো ঠিক

জায়গায় মাটি খুঁড়ে দেখল, হ্যাঁ তার স্বপ্ন হুবহু সত্যি, মাটির নীচে সত্যি একটা সোনা ভর্তি কলসী। এবার তার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না, সে আনন্দে আটখানা হয়ে গেল। তাজা গাছের যে প্রাণ আছে আর সে আমাদেরই মতো সুখদুঃখ অনুভব করে, সে সম্বন্ধে তার নিশ্চিত ধারণা হয়ে গেল। সে বাড়ি ফিরে এসে তার বিবিকে সমস্ত ঘটনাটা এক এক করে বলল। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পাপের উদয় হল আর সে মানবিকতার কথা ভুলে 'লোভ বড় বালাই'-এর বশবর্তী হয়ে চিন্তা করল যে, আমার অংশীদার যদি জেনে যায় তবে তাকেও সোনার অর্ধেক ভাগ দিতে হবে, তার চেয়ে একথা গোপন রাখাই ভালো, কাউকে না জানানোই ঠিক। কাজেই তার স্ত্রীকে ছাড়া কথাটা আর কাউকে না বলে পুরোপুরি গোপন করে রাখল।

এবার অশ্বত্থ গাছটা যেদিন কাটা হবে ঠিক সেইদিন ইশাক কুড়ুল নিয়ে এসে দলবীরের বাড়িতে হাজির হল। দলবীর এতই কৃতঘ্ন আর অমানুষ যে, অশ্বত্থ গাছটা তার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইল এবং তার বিনিময়ে এক কলসী সোনা পাইয়ে দিল, তা সত্ত্বেও তার অভর পেট ভরল না, এতটুকু দয়া হল না। আসলে তার দুঃসময় ঘনিয়ে আসছিল, আর তাই বুদ্ধিসুদ্ধিও লোপ পেয়েছিল। সে অশ্বত্থের প্রাণের কথা বিচার না করে নিজের কুড়ুল নিয়ে ইশাকের সাথে বেরিয়ে পড়ল। গাছ কাটার আগে কাঠমিস্ত্রিরা সবাইকে হাতে হাতে গুড় বিলি করে। আমরা গুড়ের লোভে সেদিন সেখানে আগে থেকে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। ওরা দুজন এসে গাছ কাটার জন্যে প্রস্তুত হল। অবাক কাণ্ড, যেই ওরা কুড়ুল দিয়ে গাছে কোপ মেরেছে, অমনি কোপ মারার সঙ্গে সঙ্গে অশথের গা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। আশেপাশে যারাই দাঁড়িয়েছিল তাদের কাপড়চোপড় রক্তে ভেসে গেল। এই দেখে তো সকলেই হতচকিত হয়ে গেল। কেউ জীবনে আজ পর্যন্ত এমন ঘটনা দেখেনি। গাছের কাণ্ড থেকে এমন রক্তের ফোয়ারা

ছোটা, এ এক সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা। ইশাক বা দলবীর জীবনে হাজার হাজার গাছ কেটেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত গাছ থেকে এমন রক্ত ঝরতে দেখেনি। কিন্তু এ জিনিস কেন হল, কী করে হল, এ রহস্য কারো মাথায় এল না। দলবীরের তো সবই জানা, কিন্তু ও তো লোভের বশবর্তী হয়ে আর মনুষ্যত্ব বিসর্জন দেওয়ায় এই রহস্যের কথা কাউকে বলতে পারছে না। সকলের কাছে সে এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন অন্যের মতো সেও কিছু বুঝতে পারছে না, ওর কিছুই জানা নেই, ব্যাপারটা কী !

ভবিতব্য বড় সাংঘাতিক। যা হবার তা আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে, তা হবেই। সকলের সামনে অশ্বত্থ গাছের একরম আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখার পরও দলবীরের চৈতন্য হল না। সে গাছটা কাটতে এতটুকু দ্বিধা করল না। কোনো পরোয়া না করে আবার কুড়ুল নিয়ে গাছে কোপ মারতে লাগল।

দলবীরের ছিল একটাই মাত্র ছেলে। সে ছিল সুস্থ ও সবল। তার রোগ বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু অশ্বত্থ গাছ কাটা আর তার সঙ্গে বেইমানি করার ফল তার নিরপরাধ ছেলেকে ভোগ করতে হল। দলবীরের ছেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। কথায় আছে না 'যেমন কর্ম তেমনি ফল'। যেমন যেমন গাছে কোপ পড়ছিল আর গাছটা কাটা পড়ছিল ঠিক তেমনি তেমনি দলবীরের ছেলের হঠাৎ করে হওয়া অসুখ তরতর করে বাড়তে লাগল। সন্ধে পর্যন্ত যেই পুরো অশ্বত্থ গাছটা কাটা শেষ হল, অমনি ছেলেটা ধড়ফড় করে মরে গেল। সারা গাঁয়ে ছেলেটার মরার খবর ছড়িয়ে পড়ল। সকলে হায় হায় করতে লাগল। কাল পর্যন্ত যে ছেলে সুস্থ ছিল সে এত তাড়াতাড়ি কী করে মরে গেল, এ রহস্য কেউ চিন্তায় আনতে পারল না। সারা গাঁয়ের লোক দলবীর মিস্ত্রির দরজায় এসে জড়ো হল। দলবীরের স্ত্রী জানত যে তার স্বামী অশ্বত্থ গাছটার সঙ্গে কী বেইমানি করেছে। সে চিন্তা করতে লাগল স্বপ্নে অশ্বত্থের প্রাণ ভিক্ষা চাওয়া আর তার পরিবর্তে সোনার

কলসী দেওয়া সত্ত্বেও তার স্বামী অশ্বত্থ গাছটাকে ছাড়েনি বরং রাক্ষসের মতো, অমানুষের মতো কাণ্ড করেছে আর তাতেই এই সর্বনাশা বিপত্তি। আমার একমাত্র ছেলে বিনা অসুখে দেখতে দেখতে মরে গেল। তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল, সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। মাথা কুটতে কুটতে বুক চাপড়াতে লাগল। সমস্ত গাঁ জড়ো হল আর কেউ একজন গিয়ে দলবীরকে খবরটা পৌঁছে দিল। দলবীর খবর পেয়ে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে চলে এল। তার বউ তাকে আসতে দেখেই জোরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল আর সকলের সামনে লজ্জা ভুলে দৌড়ে গিয়ে দলবীরের বুকে কিল চড় মারতে মারতে তার কলঙ্কের হাঁড়ি ভাঙতে আরম্ভ করল। সে সকলের সামনে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'আমার একমাত্র ছেলেকে আর কেউ মারেনি, এই যে সামনে দাঁড়িয়ে এর পাপী বাপই একে মেরেছে। এই পাপিষ্ঠ বাপই তার একমাত্র ছেলেকে মরণের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই হচ্ছে আমার ছেলের খুনি। এই পাপিষ্ঠকে গাছটা স্বপ্ন দিয়ে তার প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল, আর এক কলসী সোনা দিয়ে ওর পেট ভরাতে চেয়েছিল, তবু এর পেট ভরেনি। লোভী বেইমানটা কুড়ুল নিয়ে গাছ কাটতে চলে গেল। গাছের গা দিয়ে রক্ত বেরুল তবু খুনিটার আক্কেল হল না, শেষে নিজের ছেলের—একটামাত্র ছেলের রক্ত চুষে খেয়ে তাকে কবরে পাঠাল। ওরে পাপিষ্ঠ ! তোর মরণ কেন হল না। তুই আমার সুখের সংসারটা শেষ করে দিলি।'

এবার সারা গাঁয়ের লোক আসল ঘটনাটা জেনে গালে হাত দিয়ে সব চুপ করে রইল, মুখ দিয়ে তাদের একটা কথা বেরুলো না। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল—হিন্দুদের পুরাণের গল্পগুলো গল্প নয় বরং অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। হিন্দুরা যে গাছকে জীব বলে মনে করে, তাজা গাছকে কাটা পাপ বলে, গাছেরও যে আমাদের মতো সুখদুঃখ আছে বলে তা মিথ্যা নয়, খাঁটি সত্যি। অশ্বত্থগাছকে সাক্ষাৎ দেবতা মনে করে পূজা

করে—বলে এর পূজা করলে সব কাজে সিদ্ধি হয় আর এর অমর্যাদা করলে এর অভিশাপে মহাক্ষতি হয় তা চোখের সামনে প্রমাণ হয়ে গেল। হিন্দু আর মুসলমানরা সকলেই এক বাক্যে তা স্বীকার করল।

সারা গাঁয়ের লোক দলবীরকে ধিক্কার দিতে দিতে বাড়ি ফিরল। দলবীরও চিৎকার করে আছাড়পিছাড় দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'সত্যিই আমি আমার একমাত্র বেটাকে খুন করেছি। যদি আমি লোভ না করে অশ্বত্থের কথা মানতাম আর সোনা পেয়েই খুশি হতাম, তো আমার চোখের মণি এমনভাবে মরত না। আমি যদি তার সঙ্গে বেইমানি না করতাম, তো আমার কলিজার ধনকে কেউ কেড়ে নিতে পারত না। আমার সংসারটা জ্বলে গেল। এ ভগবানের বিচার, আমি অপরাধ করেছি গাছটাকে কেটে। বেইমানির শাস্তি ভগবান আমাকে দিয়েছেন। আমি জীবন্ত গাছের উপর আর কোনোদিন কুড়ুল, করাত চালাব না।'

দলবীর পরবর্তীকালে কোনোদিন আর কাঁচা গাছে হাত দেয়নি।

এই সত্য ঘটনা কি প্রমাণ করছে না যে, গাছের প্রতিও মানুষের ব্যবহার মানুষের মতো হওয়া উচিত ?

———— ○ ————

এক ফরাসী বিদ্বানের হিন্দুধর্ম গ্রহণ

বেশ কয়েকবছর আগের ঘটনা। ফ্রান্সের এক তত্ত্বজিজ্ঞাসু বিদ্বান ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কী তত্ত্ব নিহিত আছে তা জানবার একান্ত আগ্রহ নিয়ে পৃথিবীতে যত ধর্মগ্রন্থ আছে প্রায় সব একে একে পড়ে শেষ করেন এবং সেগুলিতে তত্ত্বের পরিবর্তে তথ্যের প্রাধান্য দেখে একরকম হতাশ হয়ে পড়েন। প্রথমে তিনি নিজ ধর্ম ইশাই ধর্মের অনুকূলে যত ধর্মগ্রন্থ আছে পড়ে সেখানে তত্ত্বের কোনো সন্ধান না পেয়ে বৌদ্ধধর্মের অনুকূলে যত পুস্তক আছে সব পাঁতি পাঁতি করে খুঁজতে থাকেন কোথাও তত্ত্বের সন্ধান আছে কি না। এখানেও তিনি দেখেন তত্ত্বের পরিবর্তে তথ্যের প্রাচুর্য অধিক। অবশেষে তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের সন্ধান পান এবং সনাতন ধর্মের অনুকূলে যত ধর্মগ্রন্থ আছে সব মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকেন। এবার পণ্ডিতের তত্ত্বপিপাসা মিটতে থাকে। তিনি বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, ভাগবতাদি যত হিন্দু ধর্মগ্রন্থ আছ সব নিখুঁতভাবে পড়াশুনা করে এবং অন্যান্য ধর্মের বক্তব্যগুলির সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষন করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, পৃথিবীতে যত ধর্মগ্রন্থ আছে, তাতে যত মত আর মতান্তরই থাকুক, যদি কিছু সার তত্ত্ব থাকে তো সে সনাতন হিন্দুধর্মেই আছে। অন্য যে সব ধর্মমত, সম্প্রদায়, সমাজ দেখা যায় এ সবই কয়েকশ্রেণীর মানুষের অহংকার থেকে সৃষ্ট, তাছাড়া এগুলিতে অন্য কোনো তত্ত্ব নাই।

ওই তরুণ বিদ্বানের ভারত আগমন

হিন্দুধর্মে প্রভাবিত হয়ে ওই ইংরেজ তরুণ ধর্মপ্রাণ মুনি-ঋষির পরম পবিত্র দেশ এই ভারতবর্ষে আসেন এবং বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। শেষে শ্রীবিশ্বনাথপুরী বারাণসী ধামে এসে উপস্থিত হন এবং সেখানকার পণ্ডিতদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তত্ত্বালোচনা করেন। বারাণসীর তৎকালীন ভারতবিখ্যাত সন্ত

স্বামী করপাত্রী মহারাজের খ্যাতি শুনে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। পূজ্যপাদ করপাত্রীজীর সংস্পর্শে এসে এই ইংরেজ যুবক খুবই প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তাঁর কাছে নিত্য যাওয়া-আসা করতে থাকেন। একদিন তিনি হিন্দুধর্মে দীক্ষা নেবার মনস্থির করে স্বামীজীকে জোড়হাত করে নিবেদন করেন যে, মহারাজ যেন দয়া করে তাকে মহান হিন্দুধর্মে আশ্রয় দেন। স্বামীজীও দেখলেন এই তরুণের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান রয়েছে, আর সে অকপটহৃদয়ে হিন্দুধর্মে আসতে চাইছে ; সুতরাং না করার কোনো অর্থ হয় না। তাই তিনি স্পষ্ট করে তাকে বললেন, 'দেখ আমি প্রাচীন শাস্ত্রীয় সনাতন ধর্মাবলম্বী। সে হিসেবে তোমাকেও শাস্ত্রীয় বিধানে হিন্দুধর্মে স্থান করে দিতে পারি। কিন্তু তুমি আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ছোঁয়াছুঁয়ি কিছু করতে পারবে না। তোমাকে তোমার মতো হয়ে এখানকার নিয়ম মেনে চলতে হবে।' ইংরেজ তরুণ এ সকল ব্যবস্থা মনেপ্রাণে আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করে নিলেন। স্বামীজী আরো বললেন, "আমাদের শাস্ত্রে সনাতন ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী তুমি 'অণ্ডজ' শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হবে। তোমাকে সেই মতো চলতে হবে। তোমার দেবমন্দিরে ঢোকা চলবে না, আর আমরা তোমার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে খাওয়াদাওয়া করব না, আর তোমাকেও সে কথা মনে রেখে চলতে হবে। তোমারও উচিত হবে না ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে খাওয়াদাওয়া করা। মন্দিরের চূড়া দেখলেই তোমার উদ্ধার হবে। শাস্ত্রের বিরুদ্ধ চলনে কোনোদিন চলবে না।" ইংরেজ ভদ্রলোক খুব বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি স্বামীজীর প্রত্যেকটি শাস্ত্রীয় কথা নতমস্তকে স্বীকার করে নিলেন। বললেন, 'মহারাজ! শাস্ত্রের বিধান মতো চলেই আমি আমার মঙ্গল চাই, সুতরাং শাস্ত্রে আর কী কী বিধান আছে আপনি আমাকে বলুন।'

অতঃপর স্বামীজী তাঁকে ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র প্রয়াগে পাঠিয়ে মাথা মুণ্ডন করালেন এবং মাথায় হিন্দুদের চিহ্নস্বরূপ একগুচ্ছ টিকি রেখে দিলেন। আর তার আগের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করলেন—শিবশরণ।

এরপর বহু বৎসর ওই ভদ্রলোক কাশীতে বাস করেছিলেন। তাঁর নাম দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। হিন্দুধর্মের উপরে তিনি বহু পুস্তক রচনা করেছেন।

আজীবন তিনি হিন্দুধর্মের রহস্য এবং বৈশিষ্ট বিষয়ে গবেষণা করে গেছেন। তাঁর লেখা বই আজও খুঁজলে অনেক পুস্তকাগারে পাওয়া যাবে।

মহারাজা রেওয়ার কুঠিতে আমার সঙ্গে তার কীভাবে দেখা হল :

দিল্লীতে একবার স্বামী করপাত্রীজী এক বিরাট ঐতিহাসিক শতকুণ্ডী মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে ভারতের বহু বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, ধর্মাচার্য, সাধু-সন্ত সমবেত হয়েছিলেন। ওই যজ্ঞ দর্শন করার জন্যে ওই ইংরেজ পণ্ডিত শিবশরণও গিয়েছিলেন, আর সেখানে রামচরিতমানসের বিশিষ্ট জ্ঞানী পণ্ডিত শ্রীমানস রাজহংস বিজয়ানন্দ ত্রিপাঠী প্রথম আমাকে এই শিবশরণের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। পুরোপুরি হিন্দু বেশভূষায় তাকে দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল।

আর একবার কাশীতে শতকুণ্ডী যজ্ঞ হয়েছিল আর আমি সেখানেও গিয়েছিলাম। কাশীতে একদিনের জন্যে থেকে এই শিবশরণের খোঁজ করে জানতে পারি উনি রেওয়ার কুঠিতে আছেন। আমি সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তখন তিনি কুঠিতেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল। আমি যখন গেলাম তখন দেখলাম, মাথায় লম্বা মোটা টিকি, তাঁর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তিনি চোখ বুজে জপে মগ্ন।

তখন তিনি কাশীতে থাকাকালীন প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করে এসে মন্দিরের চূড়ার দিকে তাকিয়ে প্রণাম করতেন এবং রুদ্রাক্ষের মালায় শিব -নাম জপ করতেন। মন্দিরের ভিতরে যেতেন না। অত্যন্ত সাত্ত্বিক জীবন-যাপন করতেন। নিয়ম মেনে চলতেন, কাউকে তাঁর হাতের খাবার দিতেন না, অন্যের সাথে একসঙ্গে বসে খেতেনও না। হিন্দুধর্মের উপর লেখা তাঁর বহু তত্ত্বপূর্ণ পুস্তক তখন বিশেষভাবে প্রচার লাভ করেছিল। তাঁর লেখাগুলো হিন্দুধর্মের উপর গভীর অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ হওয়ায়

সকলেই পড়ে খুব আশ্চর্য হয়ে যেত। তিনি তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনায় প্রমাণ করেছিলেন যে আদিতে সনাতন হিন্দুধর্মই ছিল, আর হিন্দুধর্মই সত্য ধর্ম। বাকি যে সমস্ত ধর্ম, মত, সম্প্রদায়, সমাজ ইত্যাদি দেখা যায় তা সবই পরবর্তীকালে আপন আপন সমাজের স্বার্থে, সেইভাবে গড়ে উঠেছে।

— o —
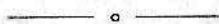
সন্ন্যাসী-ব্রাহ্মণের অর্থের সঙ্গে কীসের সম্বন্ধ ?

মীরাটের এক গ্রামে ডুঙ্গর দত্ত নামে এক সদাচারী ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি ছিলেন বিদ্বান, ত্যাগী, তপস্বী এবং এক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ। ঈশ্বর-পরায়ণ এই ব্রাহ্মণের একটি ছোট সংস্কৃত টোল ছিল। সেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সকল শ্রেণীর ছাত্রেরা সংস্কৃত শিক্ষা করত। ব্রাহ্মণ তাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক নিতেন না। না চাইতে যদি কেউ কিছু দিত তো তাতেই তিনি খুশি থাকতেন। ভগবানের দয়ায় তাঁর স্ত্রীও ছিলেন একজন পরম সাত্ত্বিক এবং ভক্তিমতী মহিলা। তিনিও সামান্যতেই খুশি থাকতেন। তাঁর বাড়িতে শালগ্রাম শিলার নিত্য সেবা হত। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এই শালগ্রাম শিলার সেবা-পূজা করেই সারাদিন কাটিয়ে দিতেন। যেহেতু তিনি কারো কাছে কিছু চাইতেন না সেজন্যে তাঁর অভাবেরও অন্ত ছিল না। কোনো-কোনো দিন তাঁদের নিরাহারেই কেটে যেত।

একদিনের কথা। কোথা থেকে হঠাৎ তাঁদের গ্রামে এক দণ্ডী সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হল। তিনি এসে গ্রামে কোনো যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আছে কিনা খোঁজ করলেন। তাঁর ইচ্ছা সেই ব্রাহ্মণের ঘরে তিনি আহার গ্রহণ করবেন। গ্রামের লোক ব্রাহ্মণ ডুঙ্গর দত্তর বাড়ি দেখিয়ে দিলে সন্ন্যাসী তাঁর বাড়িতে এসে হাজির হলেন। পণ্ডিতমশাই তো দণ্ডীস্বামীকে পেয়ে একেবারে ভক্তিতে গদগদ হয়ে পড়লেন, আর তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে তাঁকে আসন দিয়ে বসালেন। ব্রাহ্মণ তাঁকে তাঁর বাড়িতে ভোজনের জন্যে অনুরোধ করলেন। আর স্বামীজী তো ভোজনের জন্যেই তাঁর ঘরে এসেছিলেন। পণ্ডিতমশাই ঘরের মধ্যে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে স্বামীজীর আহারের বন্দোবস্ত করতে বললেন। ব্রাহ্মণী বললেন, 'প্রভু ! বাড়িতে তো আজ এক কণাও চাল বা আটা নেই, রান্না কী দিয়ে করব ?' পণ্ডিতমশাই চিন্তায় পড়ে গেলেন। শেষে ঠিক করলেন প্রতিবেশীর কাছ

থেকে কিছু আটা নিয়ে আসা যাক, তাতে যদি 'কারো কাছে কিছু চাইব না'—এ প্রতিজ্ঞা ভেঙে যায় তো যাক। ব্রাহ্মণী সেইমতো প্রতিবেশীর ঘর থেকে আটা, ডাল ইত্যাদি নিয়ে এসে রান্না করে দিলেন। ওঁরাও স্বামী-স্ত্রীতে আজ কয়েকদিন না খেয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁরা নিজেদের চিন্তা করলেন না, চিন্তা তাঁদের একমাত্র, যেন দণ্ডীস্বামী ঘর থেকে না খেয়ে ফিরে না যায়। পণ্ডিতজী সব সময় চিন্তা করছিলেন দণ্ডীস্বামী যেন কোনোক্রমেই জানতে না পারেন যে তাঁরা দু-তিন দিন না খেয়ে আছেন। ভক্তি এবং শ্রদ্ধা সহকারে রান্না হয়ে যাবার পর প্রথমে তাঁরা তাঁদের ইষ্টদেব নারায়ণ শিলাকে ভোগ নিবেদন করলেন, পরে দণ্ডীস্বামীকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে ভোজন করালেন। কিন্তু কী জানি কেমন করে স্বামীজী তাঁদের দারিদ্রের খবর পেয়ে গেলেন, আর মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, 'দেখ, কেমন ধার্মিক পণ্ডিত ব্যক্তি ! কতদিন ওরা না খেয়ে আছে তবু মনে কত পবিত্রতা, ত্যাগ আর প্রশান্তি। আবার সে কথা কাউকে জানতে দিতেও চায় না।'

পণ্ডিতমশায়ের উপরে স্বামীজীর খুব দয়া হল এবং তাঁর দুঃখ, দারিদ্র দূর করার মনস্থ করলেন। স্বামীজী সোনা তৈরি করার রসায়ন জানতেন আর নিজের কাছে আশ্রমেও কিছু সোনা ছিল। পণ্ডিতমশায়ের পাশে বসে স্বামীজী বললেন, 'পণ্ডিতমশায় আমি আজ হরিদ্বার ফিরে যাচ্ছি, আপনি অমুক দিন হরিদ্বারে অমুক জায়গায় অবশ্যই যাবেন এবং আমার সঙ্গে দেখা করবেন।' পণ্ডিতমশাই একথার রহস্য কিছুই বুঝতে পারলেন না। তবু তিনি স্বামীজীর আদেশ পালনের জন্য হরিদ্বারে যেতে রাজি হলেন, আর নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট দিনে হরিদ্বারে গিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করলেন। স্বামীজীও তাঁকে পেয়ে খুব খুশি হলেন।

পরের দিন স্বামীজী এবং পণ্ডিতমশাই উভয়ে গঙ্গাস্নান করতে গেলেন। পণ্ডিতমশাই ভক্তিভরে শাস্ত্রানুসারে স্নানাদি সেরে এসে পূজা-প্রার্থনাদি সমাপ্ত করলেন, আর তখন স্বামীজী মহারাজ পণ্ডিতমশাইকে তাঁর কাছে ডাকলেন। পণ্ডিতমশাই কাছে এলে তিনি একটা ঝুলি বার করে

তার ভিতর থেকে একটি মহামূল্য পাঁচ-সাত ভরি ওজনের সোনার মূর্তি আর একতাল সোনা বার করলেন এবং সেগুলি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, 'ডুঙ্গর দত্ত ! দেখ, এটা সোনার মূর্তি আর এটা একটা সোনার তাল, এগুলো তুমি নাও। তুমি বড় গরিব, এজন্যেই তোমাকে আমি এখানে ডেকে এনেছি। এখন যাও, তোমাকে এত সম্পদ দিয়ে দিয়েছি যে, তোমার সব অভাব আজ থেকে ঘুচে যাবে।' পণ্ডিতমশাই স্বামীজীর হাত থেকে সেগুলি নিজের হাতে নিয়ে সেখান থেকে উঠে সোজা গঙ্গাগর্ভে নেমে গেলেন। স্বামীজী এর রহস্য কিছু বুঝে উঠতে না উঠতেই পণ্ডিতমশাই মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে সেই বহুমূল্য মূর্তি আর সোনার তাল—দুটিকেই গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন এবং জল থেকে উঠে এলেন। পণ্ডিতমশাই ধনপ্রাপ্তিতে যেমন খুশি হননি, তেমনি ফেলে দিতেও তাঁর কোনো দুঃখ হল না।

স্বামীজী এই দেখে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন এবং এই ঘটনায় মনে মনে খুব দুঃখও পেলেন। তিনি উত্তেজিত হয়ে পণ্ডিতমশাইকে ধমক দিয়ে বললেন, 'এই ডুঙ্গর দত্ত ! এ তুমি কী করলে ? তোমাকে এত সব কি গঙ্গায় ফেলে দেবার জন্যে দিলাম ।'

পণ্ডিতমশাই হাত জোড় করে নম্রভাবে বললেন, 'প্রভু ! যদি ক্ষমা করেন তবে বলি।'

স্বামীজী—'বল !'

পণ্ডিতমশাই—'প্রভু ! এ কাজ আমি ঠিকই করেছি।'

স্বামীজী—'কী করে ঠিক করলে ?'

পণ্ডিতমশাই—'এ কাজ করে নিজেরও কল্যাণ করলাম আর আপনারও কল্যাণ করলাম।'

স্বামীজী—'আরে, তুমি তো এ ধন তোমার কাছেও রাখলে না, আমার কাছেও রাখতে দিলে না, তো কিসের কল্যাণ করলে ?'

পণ্ডিতমশাই—'হ্যাঁ, মহারাজ ! এই-ই আসল কল্যাণ।'

স্বামীজী—'কী করে ?'

পণ্ডিতমশাই—'প্রভু ! আমার কল্যাণ এই জন্যে যে আমি ব্রাহ্মণ, আমার ধনের কী প্রয়োজন ? আমার ধন তো তপস্যা। এই ধনের মোহে পড়ে আমার ইষ্টকে ভুলে যাব ; আর আপনার কল্যাণ এই জন্যে যে, শাস্ত্রে আছে সন্ন্যাসীর কোনো দ্রব্য স্পর্শ করাও মহাপাপ এবং তা নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। অতএব আপনার ঝঞ্ঝাটও মিটে গেল। এইভাবেই আপনার আর আমার উভয়েরই কল্যাণ হল না কি ?'

স্বামীজী এবং তাঁর হাজার হাজার দর্শনার্থী এই মহান ত্যাগের দৃশ্য দেখে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ল। তারা বলাবলি করতে লাগল, 'কলিকালে এমন ত্যাগী আর তপস্বী পুরুষও আছে !' স্বামীজীও চিন্তা করতে লাগলেন সত্যিই তো আমি বৃথাই সন্ন্যাস নিয়েছি, আসল সন্ন্যাসী তো ওই গরিব ব্রাহ্মণ ডুঙ্গর দত্ত। ডুঙ্গর দত্ত বাস্তবিকই নিজের এবং আমার—উভয়েরই কল্যাণ করেছে। এর কথাগুলো বর্ণে বর্ণে সত্য। ত্যাগই হচ্ছে ব্রাহ্মণ আর সন্ন্যাসীর অলংকার এবং তাঁদের সর্বস্ব।

——— ০ ———

শাস্ত্রানুসারে চললেই পরলোকের পথ পরিষ্কার হবে

যারা নিজেদের ইহলোক এবং পরলোকের মঙ্গল চিন্তা করে তাদের জন্যে নিম্নলিখিত বাণীগুলি অবশ্য পালনীয় :

(১) সত্য সনাতন ধর্মের তথা ধর্মশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। সনাতন ধর্মের কৃপায় তার পরলোকে বিশ্বাস জন্মায়, আর পরলোকে বিশ্বাস হলে পরলোকের পথ প্রশস্ত করবার জন্যে আগ্রহ জন্মায়।

(২) সৎসঙ্গ, কথা-কীর্তনাদিতে যোগ দেওয়া উচিত, কারণ সৎসঙ্গে গেলে আর তার কথাগুলি শুনলে পরলোক সম্বন্ধে ধারণা জন্মায় এবং সে জোর করে পাপ থেকে নিবৃত্ত হয় তথা সৎকর্ম করে পরলোকের পথ পরিষ্কার করতে আগ্রহী হয়। সুতরাং সৎসঙ্গ অবশ্য করণীয়। তুলসীদাসের বাণী :

বিনু সৎসংগ বিবেক ন হোঈ। রাম কৃপা বিনু সুলভ ন সোঈ॥

এর তাৎপর্য হল বিনা সৎসঙ্গে ভালোমন্দ বিবেক জ্ঞান হয় না, আবার ভগবানের কৃপা ছাড়াও সৎসঙ্গলাভ হয় না।

(৩) যিনি পরলোকের পথ পরিষ্কার করতে চান তিনি যেন ভুলেও কোনোদিন গো-ব্রাহ্মণকে অশ্রদ্ধা না করেন বরং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। পূজনীয় ব্রাহ্মণের কৃপা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পরলোক সংস্কারের সহায়ক কারণ তুলসীদাস তাঁর দোঁহায় বলেছেন :

মংগল মূল বিপ্র পরিতোষু। দহই কোটি কুল ভূসুর রোষু॥

এর তাৎপর্য হল ব্রাহ্মণ যদি সন্তুষ্ট থাকেন তবে সকলই কল্যাণকর। ব্রাহ্মণের সন্তুষ্টি বিধানই সর্বমঙ্গলের মূল। আর ব্রাহ্মণ যদি অসন্তুষ্ট হন বা রুষ্ট হন তবে কোটি কোটি কুল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

পুণ্য এক জগ মহুঁ নহিঁ দূজা। মনক্রম বচন বিপ্রপদ পূজা॥

এর তাৎপর্য হল কায়মনোবাক্যে যেখানে ব্রাহ্মণের চরণ সেবা হয়, সেখানে ছাড়া পুণ্যের আর দ্বিতীয় কোনো জায়গা নাই।

মৃত্যুকালে পূজনীয়া গোমাতা সকলকে ভবসাগর পার করে পরলোকে যেতে সম্পূর্ণ সাহায্য করেন। এজন্যে গোমাতার সেবা, গোমাতার প্রতি ভক্তি প্রত্যেকেরই করা উচিত।

(৪) প্রতিদিন শালগ্রাম নারায়ণের, শিবের পূজা-আরাধনা করা একান্ত কর্তব্য। ভগবান শালগ্রাম নারায়ণের যদি কোনো কারণে পূজা করা সম্ভব না হয়, তবে অন্তত তাঁকে অন্য কাউকে দিয়ে স্নান করিয়ে সেই জল পান করা উচিত এবং এই অবস্থায় তাঁকে শুধু ভোগ নিবেদন করে জলগ্রহণ করলেও মানুষ অন্তিমে সহজেই বৈকুণ্ঠবাসী হয়।

(৫) পরস্ত্রীর সহিত কোনো সম্পর্ক রেখো না, পরস্ত্রীগামী হয়ো না, নতুবা পরলোকে যাবার পর, লোহাকে আগুনে লাল করে তাতিয়ে তা দিয়ে তার যৌনাঙ্গে ছেঁকা দিয়ে ভয়ংকর শাস্তি দেওয়া হবে। আর যে চোখ দিয়ে পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি দেবে সেই চোখ দুটিকে শকুনের দ্বারা ছিঁড়ে খাওয়ানো হবে এবং ঘোর নরকে কিংবা নীচ যোনিতে যেতে হতে পারে।

তুলসীদাস তাই বলেছেন :

পর ধনকো মিট্টী গিনে, পরতিয় মাতু সমান।
ইতনে মেঁ হরি না মিলে তুলসীদাস জমান॥

এর তাৎপর্য হল পরধনকে মাটির মতো তুচ্ছ জ্ঞান কর, পরস্ত্রীকে মায়ের মতো করে দেখ, এতেও যদি শ্রীহরির দর্শন না পাও তো তুলসীদাস তার জন্যে দায়ী থাকবেন।

(৬) যে নারী বা মায়েরা নিজেদের পরলোক সুন্দর, সুখময়, আনন্দদায়ক করতে চান তারা যেন ভুল করেও পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখেন। যে নারী তার পাতিব্রত্য-ধর্ম পালন করে না আর পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সে ঘোর নরকে পতিত হয়।

(৭) নিজের বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে কোনোক্রমেই চ্যুত হয়ো না। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে চলাই কর্তব্য।

(৮) কোনোদিন ভুল করেও অশুচি পদার্থ—যেমন মদ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাবে না কারণ এর দ্বারা মানুষের মধ্যে তামসিক বুদ্ধির বৃদ্ধি হয়, আর তা মানুষকে সর্বনাশের শেষ সীমায় নিয়ে গিয়ে তবে থামে।

(৯) নিজের সত্য-সনাতন ধর্মকে প্রাণপনে রক্ষা করে চল। সনাতন ধর্মের ছত্রছায়ায় থাকলেই আমাদের ইহকাল পরকাল দুই-ই সুন্দর হবে, আর এই হচ্ছে আমাদের পরমগতি লাভের শ্রেষ্ঠ সাধনা।

(১০) পতিতপাবনী সর্বকলুষনাশিনী মা গঙ্গার দর্শন, স্নান, পূজা, নামস্মরণ তোমাদের নিত্যকর্ম হোক। কারণ হিন্দুদের শেষ সম্বল ওই গঙ্গাজল আর তুলসীপাতা আর এইসব করলে পরলোকে সদ্‌গতি প্রাপ্তি অবধারিত।

(১১) দিবানিশি শুধু রামনাম, শ্রীকৃষ্ণনাম, শিবনাম এবং সদ্‌গুরু-প্রদত্ত মহানাম জপ করা অমৃতের তুল্য। শ্রীভগবদ্‌নামামৃত পান করা সকল মানুষের স্বর্গলোক প্রাপ্তির সহজ পথ। এই-ই সর্বজীবের একমাত্র সম্বল। কলিযুগে শুধু নামই সার। জপের দ্বারা এই দুস্তর ভবসাগর পার হও।

কলিযুগ কেবল নাম অধারা। সুমরি সুমরি ভব উতরহিঁ পারা॥

(১২) পরলোকের পথ পরিষ্কার করতে শুদ্ধচিত্তে, শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীহরির ধ্যান, নামজপ, কীর্তন করা একান্ত আবশ্যক। ধর্মগ্রন্থ পাঠ এবং তার বিষয়বস্তুর মনন, নিত্য সাধুসঙ্গ এবং মহাত্মা সাধুপুরুষের সৎসঙ্গে বেশি করে উপস্থিতি পরম কল্যাণকর।

সনাতন ধর্ম এবং ভগবানের নাম প্রচারক সদ্‌গ্রন্থসমূহ নিজে পড়া এবং অপরকে পাঠ করে শুনিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ভগবদ্‌ভক্তির প্রেরণা জাগানো নিজ মঙ্গলের শ্রেষ্ঠ উপায়স্বরূপ।

এসবেই আমাদের পরলোকের পথ সুগম হবে।

——— ০ ———

॥ শ্রীহরি ॥

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র

কোড নং

(১) **1118 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতা-বিষয়ক ২৫১৫টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে

সমগ্র গীতা-গ্রন্থের বিষদ্ ব্যাখ্যা

(২) **763 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী)**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

প্রতিটি শ্লোকের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ব্যাখ্যাসহ সুবৃহৎ টীকা। সাধকগণের আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশের এক অনুপম গ্রন্থ।

(৩) **556 গীতা-দর্পণ**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উল্লিখিত ১০৮টি বিষয়ের সামগ্রিক দর্শন-ভিত্তিক অভিনব আলোচনা। গীতার গভীরে প্রবেশে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুদের পক্ষে বইটি খুবই উপযোগী।

(৪) **13 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**

অন্বয়, পদচ্ছেদসহ প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থ সহ সরল অনুবাদ।

(৫) **496 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**

মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ

(৬) **1393** শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (বোর্ড বাইন্ডিং)

(৭) **395 গীতা-মাধুর্য**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

প্রতিটি শ্লোকের পৃষ্ঠভূমিতে প্রশ্নোত্তররূপে উপস্থাপিত এই বইটি নবীন এবং প্রবীণ সকলকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

(৮) **957 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**

অতি ক্ষুদ্র আকারে সমগ্র মূল শ্লোকের অভিনব সংস্করণ।

কোড নং

(৯) 954 **শ্রীরামচরিতমানস (রামায়ণ)**
তুলসীদাসের অমরকীর্তি, মূল দোঁহা চৌপাই-এর সরল অনুবাদ।

(১০) 275 **কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়**
লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা
সাধন পথের গূঢ় তত্ত্বের সহজ আলোচনা।

(১১) 1456 **ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়**
লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা
ঈশ্বরলাভের সাধনায় রত সাধকদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তক।

(১২) 1119 **ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?**
লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা
বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বইটি খুবই উপযোগী।

(১৩) 1305 **প্রশ্নোত্তর মণিমালা**
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ৫০০টি প্রশ্নের মূল্যবান সমাধান সূত্র।

(১৪) 1102 **অমৃত-বিন্দু**
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
সূত্ররূপে উপস্থাপিত এক সহস্র অমৃত বাণীর অভূতপূর্ব সংকলন।

(১৫) 1115 **তত্ত্বজ্ঞান কি করে হবে ?**
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
তত্ত্বজ্ঞান লাভের একটি সরল মার্গ-দর্শিকা।

(১৬) 1358 **কর্ম রহস্য**
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
ভগবান গীতায় বলেছেন **'গহনা কর্মণো গতিঃ'**—সেই কর্ম-তত্ত্বের অনুপম বর্ণনা।

(১৭) 1368 **সাধনা**
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
সাধন পথের জিজ্ঞাসুদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তিকা।

(১৮) 1122 **মুক্তি কি গুরু ছাড়া হবে না ?**
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
গুরু বিষয়ক বিভিন্ন শঙ্কা-সমাধানের উদ্দেশ্যে লিখিত এই পুস্তিকাটি বর্তমানে প্রতিটি লোকেরই একবার অবশ্যই পড়া কর্তব্য।

কোড নং

(১৯) 276 **পরমার্থ পত্রাবলী**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত ৫১টি আধ্যাত্মিক পত্রের দুর্লভ সংকলন।

(২০) 816 **কল্যাণকারী প্রবচন**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

সাধকগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ১৯টি অমূল্য প্রবচনের সংস্করণ।

(২১) 1460 **বিবেক চূড়ামণি (মূল সহ সরল টীকা)**

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বিরচিত জ্ঞানমার্গের সুপরিচিত গ্রন্থ।

(২২) 1454 **স্তোত্ররত্নাবলি**

প্রাচীন বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।

(২৩) 903 **সহজ সাধনা**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

সাধনার সহজ দিগ্-দর্শন।

(২৪) 312 **আদর্শ নারী সুশীলা**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণিত ২৬টি দৈবীগুণকে কেন্দ্র করে একটি মহিলার জীবন-চরিত্র।

(২৫) 1306 **কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

কর্ম-তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা।

(২৬) 955 **তাত্ত্বিক-প্রবচন**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

গভীর তত্ত্বের সরলতম ব্যাখ্যা।

(২৭) 428 **আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

বর্তমানের অশান্ত পারিবারিক জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনার সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত পুস্তিকা।

জয়দয়াল গোয়েন্দকা প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—

(২৮) 296 **সৎসঙ্গের কয়েকটি সার কথা**

(২৯) 1359 **পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি**

(৩০) 1140 **ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব**

স্বামী রামসুখদাস প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—

(৩১) 1303 সাধকদের প্রতি
(৩২) 1452 আদর্শ গল্প সংকলন
(৩৩) 1453 শিক্ষামূলক কাহিনী
(৩৪) 625 দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম
(৩৫) 956 সাধন এবং সাধ্য
(৩৬) 1293 আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থেকয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য
(৩৭) 1469 সর্বসাধনার সারকথা
(৩৮) 450 ঈশ্বরকে মানব কেন ? নামজপের মহিমা এবং আহার শুদ্ধি
(৩৯) 449 দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গুরুতত্ত্ব
(৪০) 451 মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া
(৪১) 443 সন্তানের কর্তব্য
(৪২) 469 মূর্তিপূজা
(৪৩) 849 মাতৃশক্তির চরম অপমান
(৪৪) 1319 কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা
(৪৫) 762 গর্ভপাত করানো কি উচিত—আপনিই ভেবেদেখুন
(৪৬) 1075 ওঁ নমঃ শিবায়
(৪৭) 1043 নবদুর্গা
(৪৮) 1096 কানাই
(৪৯) 1097 গোপাল
(৫০) 1098 মোহন
(৫১) 1123 শ্রীকৃষ্ণ
(৫২) 1292 দশাবতার
(৫৩) 1439 দশমহাবিদ্যা
(৫৪) 1103 মূলরামায়ণ ও রামরক্ষাস্তোত্র
(৫৫) 330 ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)
(৫৬) 626 হনুমানচালীসা 848 (৫৭) আনন্দের তরঙ্গ
(৫৮) 1356 সুন্দরকাণ্ড 1322 (৫৯) শ্রীশ্রীচণ্ডী
(৬০) 1455 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (লঘু আকারে)
(৬১) অমৃত বাণী (যন্ত্রস্থ)
(৬২) মূল্যবান কাহিনী (যন্ত্রস্থ)
(৬৩) পরলোক এবং পুনর্জন্মের সত্য ঘটনা (যন্ত্রস্থ)